দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

করোনা আবহে
শিক্ষা সমস্যা
— পৃঃ ৬

নতুন ভারতের উপলব্ধি
সারা বিশ্ব করতে পারছে
— পৃঃ ১৭

৭২ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ১৩ জুলাই, ২০২০।। ২৮ আষাঢ় - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

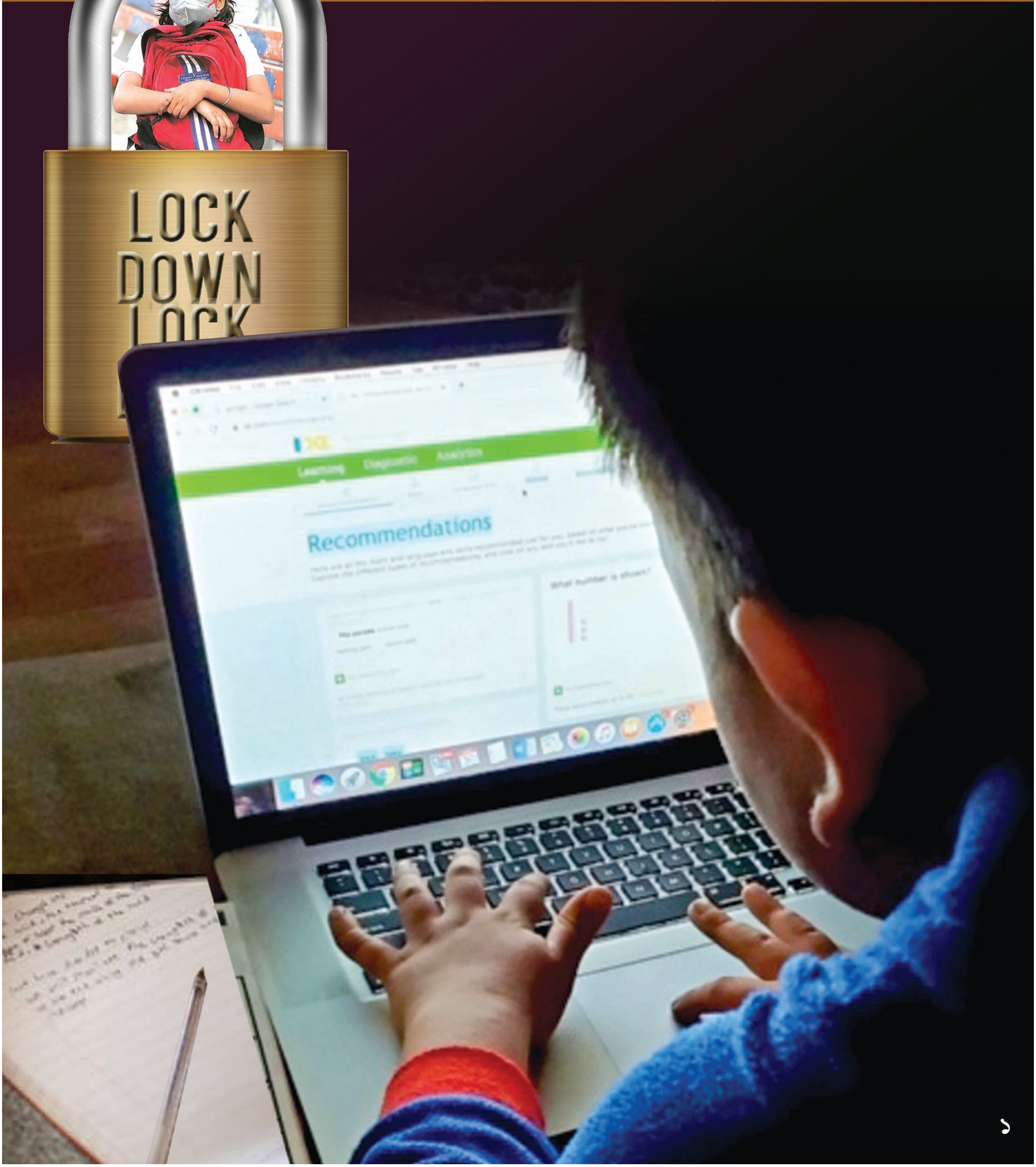

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ২৮ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৩ জুলাই - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,
Website : www.eswastika.com

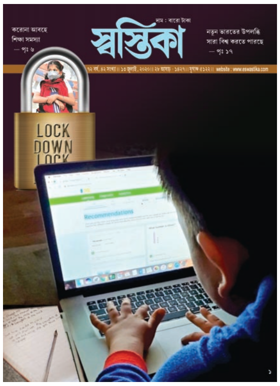

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৩

করোনা সংকটের সময় ভারত শত্রুরও মন জয় করেছে
□ সাধন কুমার পাল □ ৪

করোনা আবহে শিক্ষা সমস্যা □ বিমল কৃষ্ণ দাস □ ৬

করোনা সংকটে শিক্ষাদানের সমস্যা
□ শুভেন্দু কুমার বকসী □ ৮

মহামারী করোনা ও শিক্ষাব্যবস্থায় তার প্রভাব
□ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ১০

বিদ্যালয় ডাকছে □ গৌতম কুমার মণ্ডল □ ১২

বিদ্যালয়ের প্রাণচঞ্চল পরিবেশে ছাত্রছাত্রীরা আবার ফিরে আসুক □ রাজু কর্মকার □ ১৪

নতুন ভারতের উপলব্ধি সারা বিশ্ব করতে পারছে
□ ড. মনমোহন বৈদ্য □ ১৭

সান জু, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও তিব্বত □ প্রবাল □ ১৯

ভারত বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কীভাবে মোকাবিলা করছে □ হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা □ ২১

বাঙ্গালির হাত ধরে ওঠা বলিউট চিরকাল বাঙ্গালি বিদ্বেষী
□ সুষমা শ্রীবাস্তব □ ২৩

বাংলাদেশে বাউল ও লোকগানে জগৎ কী সংকুচিত হচ্ছে
□ ২৪

অভ্যর্থনা জানানো যাঁদের কাজ □ রূপশ্রী দত্ত □ ২৫

চিঠিপত্র : ২৬

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এত বিপর্যয়েও শিক্ষাদান অব্যাহত

করোনা সংকটে সমগ্র বিশ্ব এই মুহূর্তে বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয় হইতে কীভাবে পরিত্রাণ মিলিবে বা এই বিপর্যয় হইতে বিশ্ব কবে মুক্তি লাভ করিবে—তাহা সকলেরই অজানা। বিশ্বের প্রতিটি দেশই অন্ধকারে আলোকের দিশা হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। করোনা নামক এই বিশ্বব্যাপী মহামারী অর্থনীতি, সমাজনীতি সবকিছুর উপরই এক ভয়াবহ আঘাত হানিয়াছে। শিল্প, কর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই এক চরম মন্দাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতও যে ইহার বাহিরে তাহা নয়। সমগ্র দেশেই এই বিশ্বব্যাপী মহামারীর প্রকোপে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশেই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাথমিক ধাক্কা সামলাইয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি ছন্দে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে সরকার। তাহা যে পুরাপুরি সম্ভব হইয়াছে এমন বলা যাইবে না। তবে, শিক্ষার ধারা যেন কিছুটা সচল থাকে, শিক্ষাদানের পদ্ধতি যাহাতে কিছুটা হইলেও অব্যাহত রাখা যায়—তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা সরকার করিতেছে। করোনা পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত বিশ্বে শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষত শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে সরকার কিছুটা পরিবর্তন আনিয়াছে। করোনা সংকটের শুরুতেই সরকার অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার সহিত দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিল। সেই সিদ্ধান্ত এখনো বহাল রহিয়াছে। স্বাভাবিক পঠনপাঠন প্রক্রিয়া হইতে ব্যাহত হইলেও অনলাইন শিক্ষাদান ব্যবস্থার মাধ্যমে পঠনপাঠন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখিতে উদ্যোগী হইয়াছে সরকার। সরকারের লক্ষ্য একটিই। এই বিপর্যয় যেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস না করিতে পারে। এই অনলাইন পঠনপাঠন পদ্ধতির মাধ্যমে পুরাপুরি না হইলেও এক বৃহৎ অংশের ছাত্রসমাজের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা সচল রাখিতে সক্ষম হইয়াছে সরকার। তবে, কিছু ক্ষেত্রে এখনো সমস্যার সম্যক সমাধানের পথ উদ্ভাবন করা যায় নাই। পরীক্ষা ব্যবস্থাটি স্বাভাবিক এবং সচল এখনো পর্যন্ত করিতে পারা যায় নাই। তবে, তাহাও যাহাতে দ্রুত স্বাভাবিক এবং সচল করিয়া তুলিতে পারা যায়—তাহার জন্য সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের সহিত আলোচনা করিতেছে। আশা করাই যায়, অচিরেই সরকার একটি দিশা নির্দেশ করিতে পারিবে।

তবে, এই সংকটকালেও সবার ভূমিকা যে সঠিক বলা যাইবে না। এই সংকটের সময়ও বহু বেসরকারি বিদ্যালয় তাহাদের মানবিক মুখখানি প্রদর্শন করে নাই। বরং, অমানবিকভাবে তাহারা বর্ধিত ফি আদায়ের উপরই জোর দিয়াছে। বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য কী তাহারা নিশ্চয়ই ধার্য করিবে। কিন্তু বর্ধিত ফি ধার্য করাকে কোনোমতেই এই সময়ে সমর্থন করা যায় না। সরকারকে এই দিকটিতে সতর্ক এবং সজাগ নজর রাখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, এই সংকটকালে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেহ যেন ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত করিতে না পারে। দেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার অধিকার রহিয়াছে। সেই অধিকার হইতে কেহ যাহাতে বঞ্চিত না হয়—তাহা সরকারকেই নিশ্চিত করিতে হইবে।

এই বিশ্বব্যাপী সংকটের মধ্যেও আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া পড়ে নাই—তাহার জন্য সরকারকে সাধুবাদ দিতেই হইবে। যে কোনো সংকটই এক সময় দূর হয়। তাহার পর বিশ্ব এক নূতন যুগে প্রবেশ করে। করোনা পরবর্তী বিশ্বও এক নতুন যুগে পা রাখিবে। সেই নূতন যুগের উপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতির পক্ষেই অগ্রসর হইতেছে ভারত।

সুভাষিতম্

কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।

বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।।

বিবাহের সময় কন্যা রূপবান স্বামী চায়, মা ধনবান জামাই চায়, বাবা জ্ঞানী জামাই চায়, হিতৈষীরা সৎকুলজাত চায়, বাকি সমস্ত লোক শুধু ভালো খাবার চায়।

করোনা সংকটের সময় ভারত শত্রুরও মন জয় করেছে

সাধন কুমার পাল

বিস্ময়কর ভাবে ভারতের প্রায় ৯৩.৫ শতাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন করোনা মহামারীর মোকাবিলায় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার সঠিক পথে চলেছে। গত ২৩ এপ্রিল আইএএনএস-সি ভোটার কোভিড-১৯ নামক একটি সমীক্ষায় এই তথ্য জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ মার্চ থেকে ২১ দিনের এবং পরে ১৫ এপ্রিল থেকে ১৯ দিনের লকডাউনের ঘোষণা করেছে। যা চালু থাকার কথা ছিল ৩ মে পর্যন্ত। আইএএনএস-সি ভোটার্স সার্ভে বলছে, লকডাউনের প্রথমদিকে মোদী সরকারের কাজে ৭৬.৮ শতাংশ মানুষ আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে এই সমর্থন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৩.৫ শতাংশ। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে লকডাউন আরও কঠোর করায় ২১ এপ্রিল নাগাদ সেই সমর্থন আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৩.৫ শতাংশ। সমীক্ষায় আরও জানা যায়, লকডাউন মানার জন্য মানুষের প্রস্তুতি যেমন বেড়েছে তেমনি কমেছে অভিযোগ জানানোর প্রবণতাও। মোট ৫৪.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে তারা 'করোনা ভাইরাস থেকে প্রাপ্ত হুমকি অতিরঞ্জিত বলে বিশ্বাস করি' এই বক্তব্যের সঙ্গে তারা একেবারেই একমত নন।

শুধু দেশের ভেতরেই নয়, সমস্ত বিশ্ব করোনা মোকাবিলায় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিশ্বের সফলতম রাষ্ট্রনায়কের স্বীকৃতিও পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মার্কেট রিসার্চ কোম্পানি 'মর্নিং কনসান্ট'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় ভারত অনেক ভালোভাবে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করছে। মে মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর অ্যাপ্রুভাল বেটিং বেড়ে হয়েছে ৬৮, যা বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারিতে ছিল ৬২। এক্ষেত্রে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে এগিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর অ্যাপ্রুভাল বেটিংই সবচেয়ে বেশি। সারাবিশ্বে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় কী কাজ হচ্ছে, তার ভিত্তিতেই এই বেটিং করা হয়েছে। এ বছরের জানুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেটিং ছিল মাইনাস ১০। সেটা এখন হয়েছে মাইনাস ৩। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করতে পারেননি ট্রাম্প। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন

প্রেসিডেন্ট ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট জন মরিসন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো, জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মর্কেল, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল কাঁকর, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ও মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট লোপেজ আবরাডরকে বেটিং দেওয়া হয়েছে। মোদীর পর দ্বিতীয় সেরা বেটিং মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের।

২০১৯ সালেও শীর্ষে ছিলেন মোদী

২০২০ সালে কাকতালীয় ভাবে যে নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের সেরা নেতা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন এমন নয়, ২০১৯ সালেও তিনি একই শিরোপায় ভূষিত হয়েছিলেন। ২০১৯ সালে ব্রিটিশ হেরাল্ড সংবাদ প্রকাশনা সংস্থাটি তার ওয়েবসাইটে জানিয়েছিল— "২৫-এরও বেশি ওয়ার্ল্ড আইকন মনোনয়নের তালিকায় ছিলেন এবং বিশেষজ্ঞদের একটি বিচারক প্যানেল চারজন প্রার্থীকে '২০১৯-এ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা' এই মর্যাদাপূর্ণ শিরোনামের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছিলেন। সংগৃহীত সমস্ত পরিসংখ্যানের ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার ভিত্তিতে বাছাই প্রক্রিয়াটির মূল্যায়ন করা হয়েছিল"। পাঠকদের একটি 'বাধ্যতামূলক ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) দেওয়া হয়েছিল তাদের ভোটের বৈধতা দেওয়ার জন্য। ব্রিটিশ হেরাল্ড ওয়েবসাইটটি 'ক্র্যাশ' হয়েছিল, কারণ 'অনেক ভোটার তাদের পছন্দের নেতাদের পক্ষে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, ওয়েবসাইটটি এক সপ্তাহে প্রায় তিন মিলিয়ন বার হিট হয়েছিল। জরিপে অংশ নেওয়া ৩১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী

নরেন্দ্র মোদীকে, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের পক্ষে ২৯.৯ শতাংশ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে ২১.৯ শতাংশ এবং ১৮.১ শতাংশ চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ভোট দিয়েছেন। ব্রিটিশ হেরাল্ড ১৫ জুলাই ২০১৮ প্রকাশিত ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় নরেন্দ্র মোদীকে তুলে ধরেছিলেন। প্রকাশনাটিতে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী মোদী 'একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবান এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সম্পন্ন রাজনৈতিক ভাবমূর্তি তৈরি করেছেন, যার ফলস্বরূপ এসেছে লোকসভা নির্বাচনে অপ্রতিরোধ্য জয়।' ওয়েবসাইটিতে বলা হয়েছে 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সরকারি সফরের সময় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মোদী বিশ্বনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।'

মোদীকে চিঠি লিখে প্রশংসা বিল গেটসের

'করোনা মোকাবিলায় আপনার নেতৃত্ব প্রশংসনীয়'— মোদীকে চিঠি লিখে প্রশংসা বিল গেটসের। সারা দেশে লকডাউন করে যে ভাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা গিয়েছে, তাতে ভারতের প্রশংসা করেছে বিশ্বের বহু দেশ। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে একইভাবে প্রশংসা করলেন বিল গেটস। আগেভাগে লকডাউন করা, সংস্পর্শে আসা লোকজনকে চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে টেস্টিং ও চিকিৎসা— পুরো ব্যবস্থাপনারই ভূয়সী প্রশংসা হয়েছে মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠাতার চিঠিতে। ভারতে সংক্রমণ শুরু হয়েছিল জানুয়ারি মাসে। প্রথম কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে কেরলে। সেই রাজ্যে এখন প্রায় নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে সংক্রমণ। গোয়া, মণিপুর, অসম, সিকিম-সহ বেশ কিছু রাজ্যে নতুন সংক্রমণের খবর নেই। প্রথমদিকের প্রায় চার মাসে সারা দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। ফলে ইউরোপ-আমেরিকার বহু দেশের চেয়ে ভারতের পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা গিয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্বের বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা মহল। পাশাপাশি গোটা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারতের প্রশংসাও করছেন তাঁরা। তাতে সুর মেলালেন বিল গেটসও। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে লেখা চিঠিতে তাঁর বক্তব্য, ''আপনার নেতৃত্বে এবং আপনার সরকার যে ভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, আমরা তার প্রশংসা করি। দেশ জুড়ে লকডাউন, আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা, হটস্পট চিহ্নিত করে সেগুলিকে আলাদা করে, আইসোলেশন, কোয়রান্টিন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে মজবুত করে ব্যয়বরাদ্দ করা— সব ক্ষেত্রেই খুব ভালো কাজ করেছেন আপনারা।'' করোনার মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকার 'আরোগ্য সেতু' অ্যাপ চালু করেছে। করোনা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য মিলছে সেই অ্যাপে। তার প্রশংসা করে বিল গেটস লিখেছেন, ''আরোগ্য সেতুর মতো অ্যাপ চালু করে ডিজিটাল অভিনবত্বের সূচনা করেছেন। আমি আনন্দিত যে আপনার ব্যতিক্রমধর্মী ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করেছেন। কোভিড-১৯-এর মোকাবিলায় সূচনা করেছেন আরোগ্য সেতুর মতো অ্যাপ।''

বিশ্বজুড়ে ভারতের মানবিক মুখ

প্রাথমিক পর্যায়ে করোনা সংক্রমণে বিপন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, জার্মানি, বাহরিন, নেপাল, ভুটান, ব্রাজিল, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, সেশেলস, মরিশাস ও ডমিনিকান রিপাবলিক-সহ ১৩টি দেশে করোনা ভাইরাস মোকাবিলা করার ওষুধ এইচসিকিউ বা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন পৌঁছে দিতে ভারত মানবিক দায়িত্ব পালন করে সমস্ত বিশ্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

করোনা সংকটের সময় ভারত শত্রুরও মন জয় করেছে

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানকে তাদের আকাশপথে স্বাগত জানিয়েছে পাকিস্তান। শুধু তাই নয়, করোনা ভাইরাসের আবহে যে ভাবে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া, তার প্রশংসাও করেছে পাকিস্তান। বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পর থেকেই নানা প্রান্তে আটকে থাকা ভারতীয়দের উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া। ইতালি, ইরান, চীন-সহ করোনা ভাইরাস সংক্রমিত বেশ কিছু দেশ থেকে ভারতীয়দের উদ্ধারের পাশাপাশি ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার মতোও কাজ করছে তারা। এমনকী, ভারতে আটকে থাকা বিদেশি নাগরিক এবং পর্যটকদের বিশেষ বিমানে সংশ্লিষ্ট দেশে পৌঁছে দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া।

করোনা সংকটের মধ্যে এই উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাওয়ায় বহু দেশের প্রশংসা কুড়িয়েছে ভারতের বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া। এবার এই তালিকায় ঢুকে পড়েছে পাকিস্তানও। শুধু প্রশংসা করাই নয়, তাদের আকাশপথ ব্যবহারেরও অনুমতি দিয়েছে পাকিস্তান। এয়ার ইন্ডিয়া সূত্রে খবর, গত ২ এপ্রিল তাদের একটি বিমান মুম্বই থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে যাচ্ছিল। পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢোকার পর সে দেশের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন পাইলটরা। প্রথমে উত্তর না আসায় ফ্রিকোয়েন্সি বদলে ফের যোগাযোগের চেষ্টা করেন তাঁরা। পাকিস্তান এটিসি থেকে এবার উত্তর আসে--- 'পাকিস্তানের আকাশে স্বাগত আপনাদের।' পাক এটিসি থেকে এর পর বলা হয়, 'এরকম একটা অতিমারীর আবহেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, আপনাদের জন্য আমরা গর্বিত।'

এয়ার ইন্ডিয়াকে আকাশপথ ব্যবহার করারও অনুমতি দিয়েছে পাকিস্তান। এয়ার ইন্ডিয়া সূত্রে জানানো হয়, করাচির আকাশপথ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায় উড়ান পথের ১৫ মিনিট সময় বেঁচে গিয়েছিল। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি যখন ইরানের আকাশপথে ঢোকে, সে দেশের এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না পাইলটরা। তখন পাকিস্তান এটিসি ইরানের সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের যোগযোগ করিয়ে দেয়। অল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে ইরানও সহযোগিতা করে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। ফলে নির্ধারিত সময়ের অনেকটা আগেই ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছে যায় বিমানটি। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

করোনা আবহে শিক্ষা সমস্যা

বিমল কৃষ্ণ দাস

করোনার বেড়াজালে শিক্ষাও আজ সংকটের সম্মুখীন। মার্চ মাস থেকে লকডাউনের ফলে সমস্ত শিক্ষালয় বন্ধ। শিক্ষার্থী আসে না, শিক্ষক-শিক্ষিকা আসেন না, শিক্ষা কর্মীরাও নন। একা বিদ্যালয় ভবন দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও হয়তো পাহারাদার আছে, কোথাও নেই। করোনার আক্রমণে এধরনের প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ ছাড়া যে বিকল্প কোনো পথ নেই বা ছিল না একথা প্রকৃত সত্য। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র, যেখানে সরকারের ইতিবাচক, নিরপেক্ষ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তার অভাব এবং সহজে আত্মপ্রচার লাভে ইচ্ছুক কিছু রাজনীতিবিদ বা অত্যুৎসাহী চিন্তাবিদদের সিদ্ধান্ত, কথা, প্রচার ইত্যাদি শিক্ষার পরিবেশকে নিত্য জটিল করে তুলছে। যেহেতু আমি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি তথ্য ও পরিস্থিতির উপলব্ধির কথা তুলে ধরছি।

সারাদেশে দু' প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলে। সরকারি ও বেসরকারি। বেসরকারি বা প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও দু-প্রকারের। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত ও সরকারি অনুদান বিহীন বিদ্যালয়। সারাদেশে প্রায় চার লক্ষের মতো এরকম প্রাইভেট স্কুল বর্তমান, যেখানে ৭.৯ কোটি ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০ হাজারের কিছু বেশি এমন বেসকারি বিদ্যালয় রয়েছে। সংখ্যাটা নিঃসন্দেহে অবজ্ঞা করার মতো নয়। তাছাড়া এদের অবদানও কম নয়। নতুবা সরকারি স্কুল ছেড়ে ছাত্র-ছাত্রী বেসরকারি স্কুলে কেন যাচ্ছে! অথচ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে কিছু সরকারি নির্দেশ বা পরামর্শ, রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য, কিছু মানুষের অবিবেচনা প্রসূত মন্তব্য প্রাইভেট স্কুলগুলির পক্ষে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বলা হচ্ছে (১) করোনার এ সময়ে কোনো ফিজ বৃদ্ধি চলবে না। (২) শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতনে ছাড় দেওয়া হোক। স্কুল বন্ধ বেতন কেন দেব? (৩) শিক্ষার্থী স্কুলে আসে না অতএব স্কুল বাসের পয়সা কেন দেবে? এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে একটা বিষয় আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই প্রাইভেট স্কুলগুলি দুটো তিনটে ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগে যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অভিভাবকরা পড়ান। এগুলো অতি উচ্চবিত্ত স্কুল। সাধারণত ইংরেজি মাধ্যমেই এখানে পড়ানো হয়। এধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত কোনো পারিবারিক ট্রাস্ট বা কোনো করপোরেট সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। এরকমই স্তরে স্তরে আছে উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত স্কুল। সমাজের মধ্যে আমাদের মানুষের স্তর যেমন একেবারে তেমনি। মজার কথা, সমালোচনা যে যাই করুক এই সমস্ত উচ্চবিত্ত স্কুল না থাকলে মন্ত্রী, নেতা, কোটিপতিদের সন্তানরা কোথায় পড়বে! তাঁরা তো শপিং সেন্টার ছাড়া কেনাকাটার জন্য সাধারণ দোকানে যান না। একরকম হলেও কম দামের গাড়িতে চড়বেন না, ব্যাপারটা এরকমই আর কি। এ সমস্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রশাসনের উচ্চমহলের নিবিড় যোগাযোগ থাকে। অতএব এই হাই প্রোফাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিরদিনই ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই আলোচনার মধ্যে এদের নিয়ে কথা বলার ধৃষ্টতা আমি করব না। তাছাড়া কিছু স্কুল আছে সংখ্যালঘু সুযোগ সুবিধার আড়ালে, তাদের নিয়েও আপাতত বলার কিছু নেই। পক্ষান্তরে দেখা যায় দেশের সব নিয়মকানুন, দুরবস্থার কোপ সরাসরি যেমন এসে পড়ে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্তের মানুষের উপরে, ঠিক তেমনি সরকারি যত নির্দেশাবলী নিয়মাবলীর কোপ এসে পড়ে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত প্রাইভেট স্কুলগুলির উপরে, যেখানে শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন এখনও দুশো- তিনশো থেকে হাজারের মধ্যে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পান তিন-চার হাজার (এখনও) থেকে দশ, বারো, পনেরো হাজারের মতো। করোনার আবহে মানুষের দুরবস্থার মধ্যে নতুন কোনো ফিজ বৃদ্ধি বা নেওয়া উচিত নয়, এটা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত এবং ঔচিত্যপূর্ণ। কিন্তু বেতন না দেওয়ার বিষয়ে যুক্তি কোথায়! কারো কোনো অসুবিধা থাকলে প্রতিটি স্কুলেই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য বিবেচনা করে ছাড় দেওয়া হয়। সে তো এখনোও হতে পারে। কিন্তু কেউ দেবেন না বা দেব না ---এ কীরকম যুক্তি! তাছাড়া একশোজনের মধ্যে একশোজনই কী দুরবস্থাগ্রস্ত, এটা কী বাস্তব! তাহলে যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা দিচ্ছেন না কেন বা টিউশন ফিজ দেবেন না কেন? তাঁরা দিলে পরে বিদ্যালয়ের যেমন সহযোগিতা হয় তেমনি যারা প্রকৃত অসমর্থ পরোক্ষভাবে তাদেরও সহযোগিতা করা হবে। বিষয়গুলি অবশ্যই ভাববার মতো। শিক্ষার্থী বেতন না দিলে হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন, কর্মীদের বেতন বন্ধ করে দিতে হবে। ছাঁটাই করতে হবে অনেককে। যা সরকারের পক্ষ থেকেও বার বার না করতে অনুরোধ করা হয়েছে। এই শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যে সাধারণ মানুষের মধ্যে পড়েন। তাঁদেরও তো পরিবার চালাবার প্রয়োজন। অথচ এদের থেকেই বহু বিদ্যালয় লকডাউনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে সাধ্যমতো অর্থ দান করেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সামান্য বেতন থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আশেপাশের সমস্যাগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিলি করেছেন। প্রসঙ্গত এটাও সত্য যে, এমনও অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা নিজে শিক্ষার্থীর বেতন বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন, অনলাইন ব্যবহার করেছেন। তাহলে টিউশন ফিজ দিতে হবে না, দেব না — এসব কথার মধ্যে কী যুক্তি আছে!

দ্বিতীয়ত, বাসের টাকা দেব কেন? আপাত

দৃষ্টিতে মনে হয় ঠিক, গাড়ি না চললে পয়সা কেন? কিন্তু একটু ভাবলে দেখা যাবে এই বাস বা পরিহহণগুলি যা সারাবছর পরিবহণের জন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। এই সমস্ত বাসের সাধারণ রুটে চলার কিন্তু অনুমতি থাকে না। তাহলে এদের যে নিয়মিত খরচ ড্রাইভার, ক্লিনার, ইনসিওরেন্স, রুট ট্যাক্স ইত্যাদি কে ছাড় দেবে? শুধু তেলের খরচ লাগে না। যাদের গাড়ি, বাস রয়েছে লকডাউনে তারা এই হিসাবটা পরিস্কার বুঝতে পারছেন। তাই এক্ষেত্রে তিরিশ শতাংশের কম-বেশি ছাড় দেওয়া যেতেই পারে, আর তা যতটা জানি অনেক স্কুল বা বাস মালিক ছাড় দিচ্ছেনও। কিন্তু দেব না বা দিতে হবে না বলে এসব উস্কানিমূলক মন্তব্য করে বিরূপ পরিবেশ তৈরির পেছনে অবশ্যই কোনো স্বার্থান্বেষীর হাত রয়েছে। আর সত্যি কথা হলো, দেওয়া, না দেওয়া, ছাড় সর্বত্র একই রকম হতে পারে না। এগুলো পারস্পরিক আলোচনার বিষয়। তবে এসমস্ত ক্ষেত্রে সরকার যদি কোনো ভরতুকি দিয়ে সহযোগিতা করেন তাহলে বলার কিছু নেই।

অনলাইনে শিক্ষা : করোনার এই সংকটকালে লকডাউনের সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে বেশিরভাগ বেসরকারি স্কুল অনলাইনে ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে। মূলত, হোয়াটস অ্যাপ ভিত্তিতেই এই ক্লাস হয়। এর সঙ্গে ভিডিয়ো, অডিয়ো কনফারেন্স, ভিডিয়ো কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বহু স্কুলে ৯০ থেকে ১০০ ভাগ শিক্ষার্থীই এই শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাদের এই পদ্ধতি বিষয়ে দু'মাসে নিজেদের মধ্যে অনেক উন্নতি ঘটিয়েছেন। কোথাও কোথাও বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ই-কনটেন্ট নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা হচ্ছে। নিয়মিত পরিবর্তিত শিক্ষাদান ব্যবস্থায় নিজেকে উপযুক্ত তৈরি করা নিত্যকার শ্রেণীকক্ষে পাঠদান থেকে বেশ কঠিন ও পরিশ্রমের বলেই আমার মনে হয়। তবুও তাঁরা মাসান্তে সামান্য কিছু যে বেতন পান তার উপরে খাঁড়ার ঘায়ের চেষ্টা। অথচ সরকারি স্কুলে অনলাইন শিক্ষায় তেমন কোনো উদাহরণ নেই, কিছু টিভি চ্যানেলের ক্লাস ছাড়া। প্রাইভেট স্কুলে সাতশো বা হাজার টাকা বেতন নিলে সরকার বা অনেকে প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু সরকারের ছাত্রপিছু মাসে ৬ হাজার টাকার কম-বেশি খরচ হয়ে থাকে — সাধারণ মানুষ এ হিসাব করেন না বা জানেন না। এগুলোতো সাধারণ মানুষেরই টাকা, তাহলে সরকারি স্কুলে পঠন-পাঠনের এই দুরবস্থা কেন? কেন গরিব মানুষের ছেলেরা দুশো টাকা দিয়েও একটা ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না, আর সরকার মাথাপিছু এত টাকা খরচ করবে! তাই দেশ জুড়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে আওয়াজ্জ উঠছে শিক্ষাখাতে প্রাপ্ত টাকা সরাসরি শিক্ষার্থীকে দেওয়া হোক ডিবিটি (ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার) পদ্ধতিতে। তারা নিজের মতো স্কুল পছন্দ করবে। তবেই সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণতা আসবে। নতুবা আর্থিক পিছয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীরা চিরদিন পিছনেই পড়ে থাকবে। এই রকম আরটিই (RTE) ক্ষেত্রে অ্যাক্ট প্রয়োগ নিয়ে যত নিয়ম প্রাইভেট স্কুলগুলির জন্য। আরটিই-র সব পরিকাঠামো কটা সরকারি স্কুলে আছে? অথচ কথায় কথায় সরকার সাধারণ বেসরকারি স্কুল বন্ধের নোটিশ ধরিয়ে দেয়, পরিকাঠামো নেই বলে। পরিকাঠামোতো সরকারের স্কুলেও নেই, সেগুলো তবে কী করে চলছে! প্রত্যেক প্রাইভেট স্কুল থেকে এনওসি-র জন্য তিন হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত টাকা নেওয়া হয়েছে (২০১৩-২০১৪) আবেদনপত্র প্রদানের সময়। আজ পর্যন্ত তার কোনো উত্তর নেই। প্রশ্নটা স্বাভাবিক, প্রাইভেট স্কুল চালানোটা কি তাহলে অপরাধ?

মূল্যায়ন : পরীক্ষা মূল্যায়ন হবে না, সব পাশ— এই ফতোয়ার মধ্যেও কোনো দূরদর্শিতা নেই। কেন হবে না। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বোর্ডের অন্তর্গত যারা, এখনও তাদের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় আছে। মূল্যায়ন সংক্ষিপ্ত, সহজ, মৌখিক নানাভাবে হতে পারে। সামান্য যা পড়াশোনা হবে তার থেকেই মূল্যায়ন হবে। এই সৃষ্টিতেই মূল্যায়ন এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। কোনো না কোনো ভাবে আমরা সর্বদা মূল্যায়িত হতেই থাকি। এমন ঘোষিত ছাড় হলে শিক্ষার্থীর মনোবল, আগ্রহ, প্রয়োজনবোধ সব নষ্ট হয়ে যাবে। কাগুজে শিক্ষা সমাজের কোনো কাজে লাগবে। করোনা যুদ্ধের এই ভয়ংকর পরিবেশ শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়েও শান্তভাবে দূরদর্শী চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। করোনার আঘাত যে ক্ষতি করে যাবে তা হয়তো দু-চার বছরে পূরণ হয়ে যাবে কিন্তু একটি প্রজন্মের ক্ষতি হলে তা পূরণ করা যে দুষ্কর হবে একথা ধ্রুব সত্য।

(লেখক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ)

করোনা মহামারীর জন্য আমাদের স্কুল সেই মার্চমাসের মাঝামাঝি থেকে বন্ধ। পড়াশোনা এখন হচ্ছে অনলাইন ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে। মনে হচ্ছে পুরো স্কুল ও টিচাররা এখন মোবাইল ফোনের মধ্যে চলে এসেছে। বাড়ির কাজগুলো মোবাইলে ম্যাসেজ ও অ্যাপের দ্বারা পেয়ে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে স্কুলের পরিবেশ ও বন্ধুদের হারিয়ে ফেলেছি। এই অনলাইন ক্লাস আমার একদম ভালো লাগছে না। কবে স্কুল খুলবে সেই অপেক্ষায় আছি।

—**নিরভ্র নাথ**, ৩ডি, প্রমীলা মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন, বাগুইআটি, কলকাতা।

এই করোনা মহামারীর জন্য বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রতি বিষয়ের ওপর অনলাইন লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে পড়াচ্ছেন, পরীক্ষা নিচ্ছেন। উপস্থিতিও নিচ্ছেন। তবে ভয় পাচ্ছি এত বেশি মোবাইল ব্যবহার করার কারণে যদি শারীরিক কোনো ক্ষতি হয়ে যায়। বিদ্যালয়ের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না , খেলাধুলা হয় না, তাই মন খুব খারাপ। কিন্তু করার কিছু নেই, করোনা থেকে বাঁচতে বাড়ির মধ্যেই থাকতে হবে।

সৌম্যদীপ রায়, পঞ্চমশ্রেণী, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

করোনা সংকটে শিক্ষাদানের সমস্যা

শুভেন্দু কুমার বকসী

বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাস একটি আতঙ্ক ও ত্রাসের নাম। গত বছর ২০১৯-এর শেষ দিকে মধ্য চীনের উহান শহর থেকে বিশ্ব মহামারী সৃষ্টিকারী এই মারণ ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং আগুনের চেয়েও অনেক দ্রুতগতিতে সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে নেয়। মধ্য চীনের উহান শহরের অবৈধ বন্যপ্রাণীর বাজার থেকে এই মারণ ভাইরাসের আবির্ভাব বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও এ ব্যাপারে চীন সরকারের এবং তৎসহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সত্য নিরূপণের ভূমিকা সম্পর্কে সারা বিশ্ব সন্দিহান। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ভারতবর্ষের উত্থাপিত চীনের ভূমিকার ব্যাপক তদন্তপ্রস্তাব বিশ্ব বিপুল ভাবে সমর্থন করেছে। এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলা যায় সরকারি ভাবে চীন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা যে খুব সদর্থক ছিল একথা বলা যায় না। যে সময়ে এ লেখা হচ্ছে সেই সময়কালে বিশ্বে প্রায় ১১ কোটি ৫৭ লক্ষ মানুষ এই মারণ মহামারীতে আক্রান্ত। বিশ্বে এই ভাইরাসে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার। ভারতবর্ষে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯৮ হাজার এবং মৃতের সংখ্যা ১৯ হাজার ৭০৩। পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সর্বশেষ সংখ্যা ২২ হাজার ১২৬ ও মৃতের সংখ্যা ৭৫৭।

সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে মার্চ ২০২০ থেকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব মারণ আকার নেয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা মাঝপথে স্থগিত করে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি ভাবে ঘরবন্দি (লকডাউন) ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। স্থগিত হয়ে যায় সমস্ত ধরনের শৈক্ষিক, ব্যবসায়িক , অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন। ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই অবস্থা এককথায় অভূতপূর্ব। সামাজিক সংক্রমণ রোধ করতে এবং ব্যাপক জীবনহানি রোধ করতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া সরকারের আর অন্য কোনো বিকল্প ছিল না।

করোনা ভাইরাস বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক চূড়ান্ত প্রতিস্পর্ধার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার যে পরিচিত কাঠামো ছিল এই বিশেষ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাকে সচল রাখা আর মারণ ফাঁদের মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মকে যেতে বাধ্য করা একই ব্যাপার। সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেই আপাত ব্যবস্থিত শিক্ষা পরিকাঠামোকে আপৎকালীন ভাবে পরিহার করতে হয়েছে। তা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক বা ভারতীয় প্রাদ্যোগিকি সংস্থানই হোক। বিশ্ব জুড়ে স্কুল বন্ধ, শিক্ষার্থীরা গৃহবন্দি, শারীরিক কাজকর্ম বা খেলাধুলার কোনো অবকাশ নেই, এমনকী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত সুযোগও অত্যন্ত সীমিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত। ভারতবর্ষে আই আই টি, আই আই এম-এর মতো সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও তাদের ক্যাম্পাস বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এমনকী জি ম্যাট, জি আর ই, এস এ টি ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত অসংখ্য বিদ্যার্থীর ভবিষ্যৎ এক চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার দাঁড়িপাল্লায় ঝুলছে। অগণিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষকদের মনে ভয়, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার যুগপৎ সংমিশ্রণে এক ভয়ংকর মানসিক অবসাদের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে কীভাবে কোন পদ্ধতিতে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পরিত্রাণের জন্য পথের অনুসন্দান এবং পরবর্তী সুচারু পদক্ষেপ কী হতে পারে যা ব্যাপক অর্থে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো পদক্ষেপ তখনই নেওয়া যেতে পারে যখন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সামগ্রিক সমস্যাগুলির অনুপুঙ্খ চিহ্নিতকরণ করা যাবে। এ বিষয়ে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা সংস্থা সঞ্চালকদের একত্রিত সামূহিক চিন্তনের প্রয়োজন। সমস্যাগুলি গ্রন্থিত করলে মোটামুটি এরকম দাঁড়ায় —

সমস্যা-১. বন্ধ শিক্ষাক্ষেত্র : মার্চ মাসের ২৫ তারিখ থেকে প্রায় তিনমাসের বেশি সময় ধরে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ। সমস্ত ভর্তি বন্ধ, সব পরীক্ষা বন্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার মন্ত্রকের সূত্র অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের আগে স্বাভাবিক পঠন পাঠন শুরু হওয়া সম্ভব নয়। এই জুলাই মাসের প্রথম দিকেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দিনের পর দিন ধরে বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতি কবে থেকে নিয়ন্ত্রণে আসবে তা কারো পক্ষেই আন্দাজ করা সম্ভব নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্ত পরিকাঠামো বন্ধ থাকার প্রভাব শুধুমাত্র স্বল্পকালীন নয়। এর প্রভাব ভয়ংকর ও সুদূরপ্রসারী। ভারতবর্ষে বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩১.৫ কোটি। এর সঙ্গে যদি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ধরা যায় তবে আরও ৩.৭৫

কোটি। সবচেয়ে বেশি যুবপ্রজন্মের দেশ হিসেবে ভারতবর্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা এতটাই বেশি যে শিক্ষাক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস জনিত এই ক্ষতিকর প্রভাব ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে প্রবল।

সমস্যা-২. পরিকাঠামোগত সমস্যা : পাঠদান ও মূল্যায়নের পরিকাঠামো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকার কারণে পুরোপুরি ভাবে ব্যাহত। হাতে-গোনা কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইন পাঠাদান চালু করতে পেরেছে। কিন্তু স্বল্প পরিষেবার বেসরকারি ও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনলাইন পাঠদান চালু করতে পারা এক অবাস্তব পরিকল্পনা। কারণ স্বল্প আয়ের অভিভাবকদের অনলাইন পাঠদান গ্রহণ করাবার মতো উপকরণের ব্যবস্থা করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এই ধরনের স্কুলগুলির শিক্ষার্থীরা স্কুলের মিড ডে মিলের স্বাস্থ্যকর খাবার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এও এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগের অপ্রাপ্তি।

সমস্যা-৩. উচ্চ, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত এবং পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা : উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্র, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত এবং পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস জনিত এই প্রায় ৫ মাস পিছিয়ে যাওয়া ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক ভাবে প্রভাবিত করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশে পড়তে যাওয়ার হিসেবে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, চীনের পরেই। পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন না হলে দীর্ঘকালীন প্রভাব হিসেবে আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ কমাটাই স্বাভাবিক।

সমস্যা-৪. পদ্ধতিগত সমস্যা : দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা পাঠদানের পদ্ধতি অর্থাৎ বক্তৃতা পদ্ধতি ও ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করোনা ভাইরাসের মারক সংক্রমণ বাতিল করে দিয়েছে। সেটা স্বল্পকালীন না দীর্ঘকালীন তা সময় বলবে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠদানের মাধ্যম হিসেবে প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন ও তার ব্যবহার ও প্রয়োগের সুযোগ এই সময় করে দিয়েছে। কীভাবে সমস্যাগত ভাবে এর বিচার বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের সবাইকে স্বল্প খরচেই লার্নিং পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করে বা অন্য কোনো রকম সুবিধেজনক ভাবে এই সমস্যার সঠিক সমাধান করা যায় তার দায়ভার শুধুমাত্র সরকারি নীতি নির্ধারকদের নয়, বরং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর সমাজের।

এ বিষয়ে বিশদে চিন্তন করতে গিয়ে বার বার একটা কথা মনে হয়েছে যে, মেকলে প্রবর্তিত প্রায় দুশো বছরের পুরনো এই প্রতিষ্ঠান নির্ভর শিক্ষাদানের পদ্ধতির পরিবর্তে ভারতবর্ষের প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা সনাতন গুরুকুল পদ্ধতি যদি বর্তমানেও প্রবর্তিত থাকত তবে হয়তো সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীর দেশ হিসেবে ভারতবর্ষের এতখানি ক্ষতিসাধন হতো না। উচ্চশিক্ষা বা কারিগরি ও প্রযুক্তিগত এবং পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে হয়তো বা সামান্য কিছু ক্ষতি হতো কিন্তু শুধুমাত্র সামাজিক সংক্রমণ রোধে এত বড়ো আকারে প্রতিষ্ঠান বন্ধের কোনো প্রয়োজন হতো না। সনাতন গুরুকুল পদ্ধতির ভিত এতটাই শক্তিশালী ছিল যে বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে বা অন্যান্য সংক্রমণজনিত মহামারী রোধে এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগীয় আধুনিককালের থেকে পশ্চাদপদ সময়েও গ্রহণ করতে হয়নি। ভারতবর্ষের সনাতন নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার ধারা স্বতঃ প্রবাহিত থেকেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব আঞ্চলিক কোনো স্থান ব্যতিরেকে কোনো কারণেই খুব সাময়িক ভাবে হলেও কখনোই তার গতিরুদ্ধ হয়নি।

(লেখক দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঠ্যাঙ্গাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক)

করোনার কারণে বাড়িই এখন স্কুল আর মোবাইল ফোন হয়েছে ক্লাসরুম। আমার মতো ফাঁকিবাজ ছাত্রদের জন্য এটা উত্তম ব্যবস্থা। কেননা ক্লাস চলাকালীন কেউ ঘুমিয়ে পড়লেও যে শিক্ষক পড়াচ্ছেন তিনি টের পাবেন না। আর যখন ইচ্ছা ক্লাসে ঢোকা যাবে। কৈফিয়ত চাইলে 'নেটওয়ার্ক প্রবলেম' বললেই হবে। একবার আমি ইংরেজি ক্লাস চলাকালীন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এই ক'মাসে দুপুরে ঘুমের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ ম্যামের চিৎকার— 'মৌনব, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং? আর ইউ স্লিপিং?' আমি চোখ মেলে দেখি হাত লেগে ক্যামেরা কখন অন হয়ে গেছে। একদিন তো বাংলা ম্যাম পুরো ক্লাসটাই নিলেন তাঁর ফোনের স্পিকার অফ্ করে।

আমার মনে হয়েছে সিরিয়াস ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই অনলাইন ক্লাস সত্যিই অসুবিধাজনক। তা সত্ত্বেও নেই মামার থেকে কানা মামাই ভালো। তাই যতদিন না পৃথিবী করোনামুক্ত হচ্ছে ততদিন অনলাইন ক্লাসের থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই।

মৌনব দাস, নবম শ্রেণী,
সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল, কলকাতা।

• • • • • • • • • • •

করোনার জন্য বাইরে যাওয়া নিষেধ। তাই অনলাইনে স্কুলের ক্লাস চলছে। আমার বোনেরও অনলাইনে ক্লাস। ও খুবই ছোটো, তাই সকাল ৯টা থেকে সাড়ে বারোটা ওকে সহযোগিতা করি। অনলাইনে ক্লাস খুবই অসুবিধাজনক। আমি অপেক্ষায় আছি কবে করোনা মহামরীর প্রকোপ দূর হবে, কবে স্কুলে গিয়ে ক্লাস করতে পারব।

সম্মান নন্দী, অষ্টম শ্রেণী,
নোপানি হাই স্কুল, কলকাতা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মহামারী করোনা ও শিক্ষাব্যবস্থায় তার প্রভাব

তরুণ কুমার পণ্ডিত

বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাস যখন মহামারী রূপে সমাজজীবনকে স্তব্ধ করে দিয়েছে তখন শিক্ষাঙ্গনও যে এই ভয়ংকর রোগের কবলে পড়তে বাধ্য, এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দীর্ঘ চার মাস ধরে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা বাড়িতে চুপচাপ বসে কাটাচ্ছেন। এভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় অকালে অচলাবস্থা নেমে আসবে কেউ কোনোদিন ভাবতে পারেনি। দীর্ঘ লকডাউনে শিক্ষাব্যবস্থায় যে ফাটল ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা কীভাবে পূরণ হবে, এখন সেটাই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, শিকেয় উঠেছে নিয়মিত ক্লাস ও পড়াশোনা। অথচ শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডারের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সিলেবাসের চোখরাঙানি। অনেক সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় অনলাইনের মাধ্যমে পঠনপাঠন চালাচ্ছে যাকে বলে ভার্চুয়াল ক্লাস। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দৌলতে এত দুর্যোগের মধ্যেও কিছু ক্ষেত্রে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা হলেও গ্রামীণ ভারতের এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আজ পঠন-পাঠন থেকে বঞ্চিত থাকছে। সরকার যতই বলুক অনলাইনে পাঠদানের ফলে শিক্ষায় কোনও আঁচ লাগেনি। বাস্তব অন্য কথা বলে। ইউনিসকোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী করোনা মহামারীর প্রকোপে বিশ্বজুড়ে ১৯১টি দেশের ১৫৭ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা গ্রহণ প্রভাবিত হয়েছে, তার মধ্যে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩২ কোটি।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্কুলগুলোতে এমনিতেই পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে, তার ওপর এই কোভিড-১৯-এর ছোবল, ইন্টারনেট সব জায়গায় নেই। ফলে অনলাইনে বেশিরভাগ গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনা হচ্ছে না। এছাড়াও লকডাউনের ফলে বেশিরভাগ গৃহশিক্ষক আর টিউশনি করাচ্ছেন না, যার ফলে সবচেয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে গ্রামের নিরক্ষর পিতা-মাতার সন্তানরা। শিশু শ্রমিক ও স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্কুলমুখী করার জন্য সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিড ডে মিল প্রকল্প চালু হয়েছিল। ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারাদেশে ১২ কোটি শিক্ষার্থী (মোট শিক্ষার্থীর ৬০ শতাংশ) এই প্রকল্পে উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় আবার শিশুশ্রম ও স্কুলছুটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। যদিও লকডাউনে স্কুল বন্ধ থাকায় সরকারি নির্দেশে রান্না করা খাবারের পরিবর্তে চাল, ডাল ও আলু দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তার জন্য গ্রামে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্ররা অনেকেই অভাবের তাড়নায় শ্রমিক হিসেবে কাজ যেতে বাধ্য হচ্ছে।

এদিকে বাল্যবিবাহ দীর্ঘদিন থেকে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে। গ্রামের নিরক্ষর পিতা-মাতারা বোঝা কমানোর জন্য ও ইসলামি শরিয়ত প্রথা মোতাবেক ১৩ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে দিতে আগ্রহী থাকে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, লকডাউনের মধ্যেও এই বাল্যবিবাহের হার বহুগুণ বেড়ে গেছে।

কলেজ বন্ধ থাকায় এবং বাড়ির আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় অনেক কলেজ-ছাত্রকে সবজি ও ফলমূল বিক্রি করতেও দেখা গেছে। বর্ষায় কৃষিকাজের মরসুমে নিজেদের দু'চার বিঘা জমিতে চাষ করতে বা মজুর হিসেবেও তাদের কাজ করতে হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রক যে নির্দেশ দিয়েছে সেখানেও সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। পঠনপাঠনের উপর ভিত্তি করে গড় নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের উপরের ক্লাসে উত্তীর্ণ করার কথা বলা হলেও এই মূল্যায়ন কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বেসরকারি স্কুল ও কলেজগুলোতে জনগণের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ফি বৃদ্ধি না করার জন্য সরকার নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর হচ্ছে না বলেই জানা গেছে। এদিকে জুলাই মাসের মিড ডে মিলের চাল, ডাল ও আলুর সঙ্গে তিনবারের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এতদিনে অর্থাৎ আগস্ট মাস পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের তিনটি পরীক্ষা দিতে হতো, তাই এখন তাদের এই প্রশ্নপত্রের উত্তরপত্র বাড়িতে তৈরি করেই পরে বিদ্যালয়ে জমা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। এককথায় এবারে সব

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরই এভাবে পাশ করিয়ে দেওয়ার ফলে শিক্ষার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। কিছু করার নেই, এভাবেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আগামীদিনে বয়ে নিয়ে যেতে হবে মনে হচ্ছে। কেননা স্কুল খুললেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে কীভাবে ফিজিক্যাল ডিস্ট্যানসিং বজায় রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের বসানো হবে তা এখনই বোধগম্য হচ্ছে না। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বাস্থবিধি মেনে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও একই প্রশ্ন, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী কীভাবে একসঙ্গে বসে দূরত্ব বজায় রেখে পরীক্ষা দেবে? সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় এই করোনা মহামারীর এক সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে। যেহেতু করোনার প্রকোপ এখনো কতদিন আমাদের দেশে থাকবে, বিধি মেনে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কতদিন একসঙ্গে শিক্ষার্থীরা মেলামেশা করতে পারবে না তা জানা যাচ্ছে না। তাই আগামীতে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করতে হবে বলে মনে হয়।

সবশেষে, করোনা পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা ভাবে মনস্তাত্ত্বিক স্থিতি বিচার করা দরকার। স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাড়িতে থাকতে থাকতে একঘেয়েমি এসেছে। সেক্ষেত্রে তারা বড়োদের মোবাইলে গেম ও কার্টুন দেখে কিছুটা সময় কাটাতে গিয়ে 'পাবজির' মতো মারাত্মক নেশার কবলে পড়ছে। কলেজের ছাত্ররা দীর্ঘদিন বাড়িতে গৃহবন্দি থেকে বিভিন্ন প্রকার ড্রাগে আশক্ত হয়ে মানসিক অবসাদে ভুগছে। এমতাবস্থায় কাউন্সিলিং সেন্টার তৈরি করে প্রতিকারের জরুরি ব্যবস্থা করা দরকার।

স্কুল ও কলেজের বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন মনীষীর জন্মদিন পালন করার ক্ষেত্রে এখন আর আগের মতো জমায়েত বা একত্রিত হয়ে উৎসব করা যাবে না। সেক্ষেত্রে ভার্চুয়াল পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আর সেইসঙ্গে মুখে মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটাচলার অভ্যাস সকলকে গড়ে তুলতে হবে।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আর আগের মতো হইচই, আড্ডা দেওয়া ও ভিড় জমানো যাবে না। যতদিন না পরিবেশ পরিস্থিতি ঠিক হচ্ছে শিক্ষাকে ব্যক্তিগতভাবে দক্ষতা ভিত্তিক ও সৃজনশীল হতে হবে। মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাই হবে করোনা পরবর্তী পৃথিবীর একমাত্র ব্যবস্থা।

(লেখক মালদহ জেলার কমলাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক)

করোনা মহামারীর জন্য সব কিছু থেমে গেলেও, এমনকী আমাদের স্কুল বন্ধ থাকলেও আমাদের পড়াশোনা থেমে থাকেনি। অনলাইনে এক একটি বিষয়ের শিক্ষক এক একটি বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অডিয়োর মাধ্যমে পড়া বুঝিয়ে হোয়াটসঅ্যাপব গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কঠিন বিষয়গুলি ভিডিয়োর মাধ্যমে হচ্ছে। এর মধ্যেও হাসি মজা করার সময় ক্যামেরা বন্ধ করে দিই। স্পিকার অফ করে মাঝেমধ্যে গানও শুনি। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এভাবেই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছি।

রাজদীপ ঠাকুর, নবম শ্রেণী,
ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়, মালদা।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

করোনা সংকটের দরুন গট ২৩ মার্চ থেকে আমাদের বিদ্যামন্দিরের গতানুগতিক পঠনপাঠন বন্ধ রয়েছে। একেবারে প্রথম দিকে দাদাভাই-দিদিভাইদের সান্নিধ্যে না থেকে পড়াশোনা একপ্রকার অসম্ভব মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থাটাই যেন ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই অনলাউনে পড়াসোনা শুরু হলো। প্রতিটি বিভাগের জন্য তৈরি করা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অলেকাংশেই ফিরে পেলাম দাদাভাই-দিদিভাই ও বন্ধ-বান্ধবদের। অনলাইনে আমাদের বিভিন্ন অডিয়ো, ভিডিয়ো, স্লাইড, নোট ইত্যাদি নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট অনুসারে পাঠানো হয়। সেগুলি পড়ার পর কোনো অসুবিধা হলে দাদাভাই-দিদিভাদের জানাই, তাঁরা বুঝিয়ে দেন। আবার রুটিন অনুসারে সেগুলির অনুশীলন করানো হয়। বর্তমানে এভাবেই পরিপূরক হিসেবে না হলেও বিকল্প লহিসেবে স্বীকার করে নিয়ছি অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থাকে।

নির্ণিতা ঘোষ, দশমশ্রেণী,
সারদা বিদ্যামন্দির (বাংলা),রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

আমি অনলাইন ক্লাসে নিয়মিত যোগ দিচ্ছি। কিন্তু স্কুল ও বন্ধুদের খুব মিস করছি।

জগদ্রূপা মণ্ডল, ষষ্ঠ শ্রেণী,
জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস
হাই স্কুল, জলপাউগুড়ি।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বিদ্যালয় ডাকছে

গৌতম কুমার মণ্ডল

সারা ভারতের সঙ্গে এ রাজ্যেরও সব ক্লাসরুম মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে বন্ধ। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ। ছাত্র-ছাত্রীরা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সব ঘরে। আমাদের দেশের ইতিহাসে এমন সময় আসেনি যখন এতদিন ধরে সব শিক্ষাঙ্গন বন্ধ রাখতে হয়েছে। মহামারী ও মড়কে এদেশ বার বার বিধ্বস্ত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, অজানা নানা জ্বর বার বার গ্রাম-নগর-জনপদকে উজাড় করে দিয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য এতদিন ধরে শিক্ষাঙ্গন, গুরুগৃহ, টোল কি বন্ধ ছিল? মনে হয় না। শিক্ষার্থীদের শিক্ষালয়ে আসা হয়তো কমে গিয়েছিল, হয়তো কিছুদিনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থেকেছে, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে সেগুলো বন্ধ থাকেনি। করোনা মহামারী সবকিছু স্তব্ধ করে দিয়েছে। এই সময়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে। বড়ো অসহায় এখন আমরা— ছাত্র-ছাত্রীরা, শিক্ষক- শিক্ষিকারা। কখন আবার শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানগুলো খুলবে, সেগুলো আবার শিক্ষার্থীদের কলকাকলিতে মুখরিত ও জীবন্ত হয়ে উঠবে, স্টাফরুমগুলো আবার গমগম করবে— এই আশা,আশঙ্কা নিয়ে আমরা বসে আছি।

হ্যাঁ, ছাত্র-ছাত্রীরাই এখন সব থেকে বড়ো অসহায়। আগামীদিনের চিন্তা এই কম বয়সেই যেন তাদের উপর চেপে বসেছে। এ রাজ্যে ১০ লক্ষের বেশি ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। আশার কথা, তাদের পরীক্ষা সম্পূর্ণ হতে পেরেছে। কিন্তু রেজাল্ট তো বেরোচ্ছে না। রেজাল্ট হয়তো তৈরি হয়ে আছে। সরকারের সম্মতি এলেই তা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু সে সম্মতি আসছে না। শিক্ষামন্ত্রী একটা নিদারুণ বাস্তব কথা বলেছেন— রেজাল্ট বের করেই কী হবে! তারা ভর্তি হতে কোথায় যাবে? সব স্কুল তো বন্ধ। এই অনিশ্চয়তা, ভবিষ্যতের চিন্তা মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের ক্রমশ গ্রাস করছে।

উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের তো অবস্থা আরও করুণ। তাদের পরীক্ষা সম্পূর্ণ করাই গেল না। শুধু এ রাজ্যেই নয়, সারা দেশে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে বাকি পরীক্ষাগুলো আর নেওয়া গেল না। যে পরীক্ষাগুলো হতে পেরেছে তার মধ্যে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে অসম্পূর্ণ বিষয়গুলোর নম্বর দেওয়া হবে। এভাবে নম্বর পেয়ে অনেকে খুশি হতে পারে, অনেকে আবার অখুশি। যদিও অখুশিদের জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, কিন্তু তা কখন সম্পূর্ণ হবে তা আপাতত অনিশ্চিত। এরকমভাবে প্রাপ্ত নম্বরে কি শান্তি আসে? এতদিন ধরে তারা পড়াশোনা করল, তার যথার্থ মূল্যায়ন করা গেল না। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এর মাধ্যমেই তাদের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। কেউ যায় প্রথাগত বাণিজ্য, কলা বা বিজ্ঞান শাখার উচ্চবিদ্যাচর্চায়, কেউ বা কারিগরি কিংবা চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে এবং তা উত্তীর্ণ হলে নির্দিষ্ট শাখায় চলে যায়। এই প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলোও কখন কীভাবে হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পরীক্ষাগুলো না নেওয়া গেলে শুধু ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়, দেশও এক বড়ো সমস্যায় পড়বে। প্রথাগত শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম ব্যাচগুলো কীভাবে নির্দিষ্ট হবে তা স্থির করা যেন এক বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার মধ্যে আছে ১০+২-এর লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, তাদের অভিভাবকেরা এবং অবশ্যই দেশের সরকার।

ইউ জি সি-র নির্দেশিকা অনুযায়ী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শেষ সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন এবং আগের সেমিস্টারে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে রেজাল্ট তৈরি করার কাজ চলছে। লিখিত মূল পরীক্ষা এদের ক্ষেত্রেও বাতিল হয়ে গেছে। অর্থাৎ ছয় মাস কয়েকটি বিষয়ের পড়াশোনা করার পরেও তার পরীক্ষা দিতে পারল না ছাত্র-ছাত্রীরা। এর যে কী কষ্ট তা ওই ছাত্র-ছাত্রীরাই জানে, অন্য কেউ নয়। তাদের কাছে নম্বরই সব নয়।

করোনা এমন একটি মহামারী তাতে একত্র সমাবেশ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। এই সমাবেশ আবার যদি একটি ঘরের মধ্যে হয় তাহলে তার ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। এই আশঙ্কার দিকে লক্ষ্য রেখেই ক্লাসরুম খুলতে সরকার ভয় পাচ্ছে। তাই ক্লাসরুমের তালা আবার কখন খুলবে, খোলা উচিত— এটাই এখন দেশের সব থেকে বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্ন, সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশের সব থেকে সম্ভাবনাময় মানবসম্পদ কিশোর-তরুণ-যুবকরা আজ যেন খানিকটা দিশাহীন।

এই নিবন্ধ লেখকের মেয়ে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়াশোনার রুটিনের মধ্যেই সে থাকে। বাংলা, ইতিহাস, ইংরেজি, গণিত একের পর এক পড়াশোনা আর লেখালেখির মধ্যেই তার দিন কেটে যায়। শুধু আমার মেয়ে বলে নয়। সে তো এ রাজ্যের, এ দেশের কোটি কোটি এ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীর প্রতীক। সে যে কেউ হতে পারে। তারা পড়াশোনা করছে এবং সবাই প্রায় গৃহবন্দি। বাইরের খেলাধুলাও এখন প্রায় বন্ধ। তবে হ্যাঁ, বর্ষার সময় চলছে। গ্রামগঞ্জে এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা পরিবারের লোকেদের সঙ্গে এখন চাষের কাজে হাত লাগাবে। শিক্ষকতার চাকরিতে দেখেছি এই সময় ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা কমে যায়। কারণ তারা চাষের কাজ করে। তাহলে এখন বিষয়টা এরকম--- স্কুল কলেজ সব বন্ধ, ছাত্র-ছাত্রীরা আপাতত চাষ করছে। বিষয়টা ভাবতে খুব একটা ভালো লাগছে না।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি গত প্রায় চারমাস ধরে বন্ধ। ধুলো পড়ছে বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রগুলোর

বারান্দায়, ক্লাসঘরে, বেঞ্চ-ডেস্কে, চেয়ারে-টেবিলে। এগুলো যদি কোনো প্রাণবান সত্তা হতো তাহলে তাদের অসহায়তাও যেন তারা অনুভব করত। ক্লাসের বেঞ্চ-ডেস্কগুলো হয়তো ডাকতো তাদের উপর প্রতিদিন ঠেলাঠেলি করে বসা শিশু কিশোর থেকে তরুণ যুবাদের। স্পষ্ট অনুভব করত তাদের হইহল্লা, দাপাদাপি। ঢাকত্তে লাইব্রেরির বইগুলো, সেলফগুলো, অ্যাটেনডেন্স খাতাগুলো, কালো কালো বোর্ডগুলো। বর্ষার জল পেয়ে স্কুল কলেজের মাঠে মাঠে জন্মাল ঘাস। সেখানে আর খেলে না ছেলে-মেয়েরা। যে মাঠগুলোকে মনে হত রুক্ষ কাঁকুরে ডাঙা সেগুলো এখন কচি কচি সবুজ ঘাসে ভরা। স্কুল-কলেজের বাগানে উদ্যানে ঝোপ জঙ্গল আগাছা। মিড ডে মিলের রান্নাবান্না আর গরম খাবার পরিবেশন করতে করতে যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এক সময় হাঁপিয়ে উঠতেন, তাঁরাও এখন কর্মহীন। হয়তো তাদেরও ডাকছে সেই কচি কচি মুখগুলো যারা গরম ডাল ভাত খেয়ে ভরা পেটে খুশি হয়ে উঠত। স্কুল কলেজের গেটে গেটে টিফিন সময়ে যেসব কাকু মাসিরা আলুকাবলি, ঘুগনি, ফুচকা, চটপটে ছোলামশালা নিয়ে রোজ হাজির হতেন তাঁরাও কাজ হারিয়েছেন। হয়তো জীবিকার প্রয়োজনে অন্য কোনো উপায় বের করেছেন তাঁরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিদিন তাদেরও হয়তো ডাকছে সেইসব তালা দেওয়া বড়ো বড়ো গেটগুলো। স্টাফরুমগুলোর সারি সারি চেয়ারে, লম্বা বড়ো টেবিলে যেখানে প্রায়ই নানা মতের, নানা তর্কের তুফান উঠত সেখানে আজ অদ্ভুত নীরবতা। গৃহবন্দি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও হয়তো এই স্টাফরুমগুলো ডাকছে। কতদিন আর ঘরে বসে থাকা যায়! এই অন্তবিহীন ছুটি আর কারই বা ভালো লাগে!

করোনা মহামারী থেকে আর্থিক ক্ষেত্রকে বাঁচানোর জন্য সরকার বহু পরিকল্পনা নিয়েছে। শুরু হয়েছে সব ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে আনলক পর্ব। বহু অর্থ ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু এখনো লক বা তালাবন্ধ শিক্ষাক্ষেত্র। এর সঙ্গেই যুক্ত আছে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, দেশের সেরা মানবসম্পদ। এই ক্ষেত্রকেও কীভাবে খোলা যায় সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই ভাবনাচিন্তা চলছে। আশা করা যায়, খুব দ্রুত এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই ক্ষেত্রকেও খোলা হবে। অনলাইনের নানা কোর্স ভালো। এই সংকটের সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্তত সে সম্পর্কে খানিকটা জেনেছে। কিন্তু তার বহু সীমাবদ্ধতা। মুক্ত বিদ্যাচর্চার জন্য শিক্ষাঙ্গনগুলো যাতে শীঘ্র খোলা যায় আমরা সেই আশা করতেই পারি। কারণ সেগুলো এবার আমাদের ডাকছে।

(লেখক পুরুলিয়ার নেতাজী সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক)

করোনার কারণে কলেজ না গিয়ে বাড়িতে বযে গত নিনমাস ধরে যে অনলাইঈন ক্লাস করথি তার কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, আমরা ঘরে বসেই ক্লাস করতে পারছি। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইউটিউব ভিডিয়ো অথবা পিডিএফ দিয়ে থাকেন সেগুলো যেকোনো সময় খুলে দেখত পারছি এবং পজ করে, রিপিট করে দেখতে পারছি, যা ক্লাসরুমে সম্ভব নয়। ফলে কোনো কোথাও বুঝতে ভুল হলে বা দেরি হলে সেটা পুরায় দেখতে পারছি এবং পরবর্তীতে পরীক্ষার আগেও সেগুলো একবার করে দেখে নিথে পারব। অনলাইন ক্লাসে অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছোটো ছোটো গ্রুপ করে আলাদা ভাবে গক্লাস করাচ্ছেন। তারফলে প্রত্যেকটি ছাত্রের আলাদা ভাবে যত্ন নেওয়ার সুযোগ থাকে। ক্লাসরুমে এরকম সুযোগ হয় না। এর কতকগুলি অসুবিধাও আছে। সব জায়গায় নেটওয়ার্ক ভালো নেই। তাই লাইভ ক্লাস মিস হয়ে যেতে পারে। প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস অনলাইনে সম্ভব নয়।

নন্দিতা বর্মন, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, এমবিবিএস, দ্বিতীয় বর্ষ, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটাল।

• • • • • • • • • • •

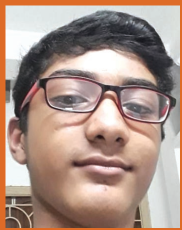

করোনার পরিস্থিতিতে স্কুলে ও প্রাইভেট টিউশনে যাওয়া সবই বন্ধ। আমাদের স্কুলের তরফ থেকে কোনো অনলাইন ক্লাস হচ্ছে না। আমাদের প্রাইভেট টিউটর নিয়মিত অনলাইন ক্লাস চালাচ্ছেন। এতে আমি উপকৃত হচ্ছি। তাঁরা খুব যত্ন সহকারে পড়াচ্ছেন। তবে স্কুলে যেতে না পারা ও বন্ধুদের না দেখতে পাওয়ায় মন ভালো লাগছে না।

ইন্দ্রনীল কর্মকার, নবম শ্রেণী, অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা।

• • • • • • • • • • •

অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সবাই চেষ্টা করছেন ভালোভাবে সবটুকু বুঝিয়ে দেওয়ার কিন্তু সে সবই থিয়োরি। প্রাকটিক্যাল কিছুই হচ্ছে না। ফলে এক বিশাল ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে মনে। বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের মতো বিষয় হাতে-কলমে না শিখে শুধু থিয়োরি পড়লে অদূর ভরিষ্যতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হবে।

শুভদীপ ঘোষ, তৃতীয় বর্ষ, মাইক্রোবায়োলজি অনার্স,বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বিদ্যালয়ের প্রাণচঞ্চল পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা আবার ফিরে আসুক

রাজু কর্মকার

শিক্ষার ক্ষেত্রে লকডাউনের প্রভাব কী হতে পারে সেই সম্পর্কে পৃথিবীর কারোরই কোনো পূর্বানুমান ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ গাঢ় কালো মেঘ নেমে আসবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মার্চের প্রথম সপ্তাহেই শিক্ষাক্ষেত্রে সারা দেশেই প্রথম লকডাউন নেমে আসে। চীনের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাই হোক বা আর্থিক দিক থেকে সারা বিশ্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজেকে সুপার পাওয়ার হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই হোক, সুকৌশলে করোনা ভাইরাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। তখন চীনের একনায়কতন্ত্রী সরকার হয়তো ভাবতে পারেনি কোটি কোটি শিশুকে শিক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত করবার জন্য মহা পাপের ভাগ তাদের নিতে হবে।

যাইহোক, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক পড়াশোনা অপেক্ষাকৃত কম হয়। প্রি-প্রাইমারি, প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি ও হাইস্কুল লেবেলে আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয় কেন্দ্রিক পড়াশোনা হয়ে থাকে। প্রি-প্রাইমারি ও প্রাইমারি লেবেলে দেখা যায় শিশুর জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয় একাত্ম হয়ে জুড়ে থাকে। স্কুল তাদের দ্বিতীয় বাড়ি হিসেবে পরিগণিত হয়। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার পর শিশুদের সব আশা, ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে ছোটো ছোটো সুন্দর বিদ্যালয়গুলি।

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে খেলাধুলা, সংগীতচর্চা, শারীরশিক্ষা, গল্পবলা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর একটি স্বপ্নের জগৎ তৈরি হয়ে থাকে। সব মিলিয়ে শিশুর কাছে বিদ্যালয় ও তার পরিবেশ স্বর্গীয় অনুভূতির সৃষ্টি করে।

এতদিন পর্যন্ত সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে বিদ্যালয়ের পড়া প্রস্তুত করে, স্নান খাওয়া সেরে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য স্কুলভ্যান বা পুলকারের জন্য অপেক্ষা করা বা হইহই করে ছুটে বিদ্যালয়ে যাওয়া এই ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের রোজনামচা। প্রাণচঞ্চলতায় ভরপুর শিশুরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সব কাজ করত। মনে হতো শিশুর মানসিক গতি পৃথিবীর গতির থেকে বেশি । কিন্তু এই ক'মাসে সব যেন উলটপালট হয়ে গিয়েছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দের মতো ছাত্র-ছাত্রীরা যেন তাদের গতি হারিয়ে ফেলেছে। প্রাণচঞ্চল নদী বনো বড়ো পাথর ও কংক্রিটের মোটা দেওয়ালে বাধা পড়ে বদ্ধ জলাধারে পরিণত হয়েছে।

তবে আশার কথা, ঈশ্বর শিশুদের মধ্যে অপূর্ব তেজ ও শক্তি প্রদান করেছে। মহাভারতের যুদ্ধে অভিমন্যু যেমন সপ্তরথী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন, তদ্রূপ আজকের ছাত্র- ছাত্রীরাও তাদের সংকল্পে অবিচল রয়েছে। স্কুলের কলরব নেই, বন্ধুদের সঙ্গে খুনসুটি নেই, শিক্ষক-শিক্ষিকার তর্জন গর্জন নেই, নিঃশ্বাস ফেলবার বড়ো প্রাঙ্গণ নেই, তথাপি উদ্ভূত পরিস্থিতির বাধা সত্ত্বেও ফল্গুধারার মতো ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাপ্রবাহ চলছেই — এটি দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। ছাত্রানাং অধ্যায়নং তপঃ— মহামারী করোনা সংকটেও এই মন্ত্র যেন সমান সত্য।

প্রধান শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের যখন ফোন করি তখন প্রায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর একটা কমন আবেদন — স্যার, স্কুল কবে খুলবে? আবার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে কবে, আবার স্যার ম্যামরা পড়া শোনাবেন কবে, স্যারেদের মুখে মজার গল্প শোনা হবে কবে, পিটি-ব্যায়াম হবে কবে, জোরদার খেলাধুলা হবে কবে? শিশুর ইচ্ছা কবে পূরণ হবে জানি না। কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে তাদের উৎসাহ যে ভরপুর — এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের বিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে পড়াশোনা চলছে তার মোটামুটি রূপরেখা হলো—

১. কোনো একটি বিষয় বোঝানো হচ্ছে তার ভিডিয়ো রেকোর্ডিং করে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইউটিউবের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পাঠানো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। কোনো ছাত্র-ছাত্রীর কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকলে তা গ্রুপে পোস্ট করা হচ্ছে, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আবার তৈরি করে গ্রুপে পোস্ট করছেন। বিভিন্ন মিটিং অ্যাপের মাধ্যমে সব ছাত্র-ছাত্রীকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েও. পড়াশুন চালানো হচ্ছে।

২. জটিল ও কঠিন প্রশ্নের উত্তর

শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজে হাতে লিখে বা টাইপ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে ওঠা গ্রুপে পোস্ট করছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা সেই সব প্রশ্নের উত্তর বার বার পাঠ করছে, মুখস্থ করছে, আত্মীকরণ করছে। অপর দিকে ছাত্র-ছাত্রীরাও হোম ওয়ার্ক তৈরি করে লিখে ফেলছে এবং তার ছবি তুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে তা আবার ছাত্র-ছাত্রীদের ফোনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

৩. পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ক্লাস পরীক্ষা, পার্বিক পরীক্ষা ও বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে থাকে। প্রায় প্রতিমাসেই কোনো না কোনো পরীক্ষা হয়ে থাকে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে সিলপ্যাক করা প্রশ্নপত্র অভিভাবকের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট সময় প্যাক খুলে শিশুরা পরীক্ষা দিচ্ছে এবং উত্তরপত্রটি আবার বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে অভিভাবকরাই বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট উপস্থিত থাকছেন ও পরীক্ষক হিসেবে খাতাতে সই করছেন।

৪. কোনো কোনো বিদ্যালয় আবার অনলাইনেই নির্দিষ্ট সময় প্রশ্নপত্র পাঠাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তর লিখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছবি করে অনলাইনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ উত্তরপত্রটির প্রিন্টআউট করে নিয়ে মূল্যায়ন করছেন।

৫. বেশকিছু বিদ্যালয় আবার অনলাইন মিটিং অ্যাপের মাধ্যমে সব ছাত্র-ছাত্রীকে একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন করছে।

যে ব্যবস্থার কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এই ব্যবস্থার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিল না। হঠাৎ করে সম্পূর্ণ এক নতুন ব্যবস্থা অনলাইনে পঠনপাঠন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এসে হাজির হয়েছে। নতুন কোনো ব্যবস্থাকে আত্মীকরণ করতে সময় লাগে। শিশুরা কিন্তু সেই সময় পায়নি। তাই তাদের জীবনে এই ব্যবস্থার প্রভাব সুখকর বলে আমার মনে হচ্ছে না। তারা হয়তো উৎসাহের সঙ্গে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করে নিচ্ছে কিন্তু শারীরিক ও মানসিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

বর্তমানে বেশ কিছু শিশুর ইমিউনিটি পাওয়ার বেশ কম। এ কারণে মোবাইল থেকে নির্গত রেডিয়েশনের প্রভাব শিশুর শরীর ও মনে কতটা ক্ষতি করতে পারে তা আবার নতুন করে গবেষণার বিষয় হতে পারে। মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটর বেশি ব্যবহার করার ফলে শিশুর চোখ দিয়ে জল পড়তে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে, ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে, মাথা ঘুরতে পারে। এ কারণে অনলাইন পঠনপাঠন চলার সময় মা-বাবাকে বা অভিভাবককে শিশুর কাছে বসতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, তার চোখ ও শরীরের দিকে। কোনো প্রকার উপসর্গ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এরকম পরিস্থিতি হলে কলম ধরতে হবে বাবা-মা বা অভিভাবককে। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রেরিত নোটপত্রগুলি লিখে দিতে হবে বাড়ির বড়োদের। চোখের সঙ্গে সঙ্গে কানও এক্ষেত্রে বিকল হতে পারে। হেডফোনের অধিক ব্যবহারের ফলে শ্রবণ সমস্যা হতে পারে। বেশিরভাগ হেডফোন এয়ার টাইট। এ কারণে কানে বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। এতে ঝুঁকি থেকেই যায়। হেডফোন থেকে সৃষ্টি তরঙ্গ মস্তিষ্কের জন্য গুরুতর বিপদ ডেকে আনতে পারে। এই অসুবিধাগুলি দূর করবার জন্য ব্লুটুথের সঙ্গে সাউন্ড বক্স যুক্ত করে শিশুদের পড়া শোনানো উচিত। কিন্তু ব্লুটুথ হেডফোনের ব্যবহার একেবারেই নয়।

তবে সব থেকে যেটি চিন্তার বিষয় তা হলো অনলাইন পঠন- পাঠনের জন্য শিশুর মানসিক প্রভাব। তাদের মধ্যে যদি এই ধারণা জন্মায় আর কোনোদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া যাবে না, এই ভাবেই থাকতে হবে বছরের পর বছর, তবে শিশু খিটখিটে ও জেদি হতে পারে, আবার ঝিম ধরে থাকতে পারে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য বাবা-মাকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাবা-মা-ই এখন তাদের বন্ধু,

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও খেলার সাথী। শিশুর সুকমল মনটি যদি মোবাইল ট্যাব বা কম্পিউটরের দাসে পরিণত হয়ে যায় তবে সমূহ বিপদ।

আর একটি কথা, অনলাইন পঠনপাঠন মানেই নেট কানেকশন। এর ফলে শিশুর কাছে অনভিপ্রেত কোনো লেখা বা ভিডিয়ো পৌঁছে যায় তবে উপকার থেকে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি ইউরোপ আমেরিকা-সহ পশ্চিমি দেশগুলিতে বহু আগে থেকেই অনলাইন পঠনপাঠন ব্যবস্থাটি আংশিক রূপে রয়েছে। ফলে ওইসব দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণে কিছু মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও উদ্ভাবনী প্রতিভা বেশি। অন্যদিকে, সেই সব দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা, অপরাধ প্রবণতা, যৌন প্রবণতা, কিশোর মাতৃত্বের প্রবণতা বেশি। তাই আমরা আমাদের সুকোমল শিশুদের মহাবিপদের দিকে যাতে ঠেলে না দিই সেদিকে কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে—

১. অনলাইন পাঠনপাঠনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে।

২. অনলাইন ক্লাস চলার সময় অভিভাবক বা অভিভাবিকাকে পাশে বসতে হবে।

৩. মোবাইল ট্যাব বা কম্পিউটরের গুণমান অর্থাৎ ছবি ও সাউন্ডের কোয়ালিটি যাতে ভালো থাকে তা দেখতে হবে।

৪. বিদ্যালয়ের সঙ্গে কথা বলা যাতে এক থেকে দু' ঘণ্টার বেশি অনলাইন ক্লাস না করে।

৫. শিশুর চোখ ও শারীরিক পরীক্ষা যাতে তিন মাসে অন্তত একবার করানো হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. বাড়িতে প্রিন্টার মেশিন অবশ্যই রাখুন, সরাসরি মোবাইল বা ট্যাব থেকে প্রশ্নোত্তরগুলি না লিখে সেগুলিকে প্রিন্ট করে দিন।

অবশেষে বলতে হয় দুর্যোগ কেটে যাক, করোনামুক্ত সূর্য উঠুক। আবার বিদ্যালয় খুলুক, ছাত্র-ছাত্রীরা তার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সহপাঠীকে খুঁজে পাক। বিদ্যালয়ের পরিবেশে ও সংস্কৃতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা আবার ফিরে আসুক। অনলাইন পড়াশুনা আলআউট হোক। তবে না চাইলেও আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে মোবাইলের কিছুটা দাসত্ব করতেই হবে। আমার মনে হয়, করোনা পরবর্তী বিশ্বেও অনলাইন পঠনপাঠন কিছুটা চালু থাকবে। তাই অনলাইন পড়াশুনার বিষয়ে আরও গবেষণা দরকার, আরও পরিকল্পনা দরকার।

(লেখক প্রধান শিক্ষক, বীণাপাণি বিদ্যাপীঠ, কালিয়াচক, মালদহ)

"Om"

M/S. RAJ KUMAR BROTHERS
M/S. R. K. BROTHERS

IRONSTEEL, HARDWARE MERCHANTS
COMMISSION AGENT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

STOCKIST OF :-

M.S WIRE ROD/ TMT, TATA HB, ANEALED & G.I. BARBED CONCERTINA WIRE, WIRENETTING & CHAIN LINK, WIRE NAILS, K.K. NAILS, PANEL PINS, TARFELT, BOLT NUTS & RIVETS, PLASTIC (POLYTHENE), PVC, GI, CORRUGATED SHEET, ELECTRODES & AGRICO TOOLS ETC.

167, Netaji Subhash Road, (Raja Katra), Kolkata-700 007
Ph. 22580040/41 M- 9830630343
email : sushilbagaria@yahoo.in

নতুন ভারতের উপলব্ধি সারা বিশ্ব করতে পারছে

ড. মনমোহন বৈদ্য

ভারতে করোনা মহামারী যুদ্ধের মাঝে চীনা সৈন্যদের পুনরায় লাদাকের সীমা অতিক্রমণ এবং গলওয়ানে হওয়া সংঘর্ষে সীমান্ত ২০ জন ভারতীয় জওয়ান বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন। এই অপূরণীয় ক্ষতি নিয়ে মিডিয়ায় খুব চর্চা হয়ে চলেছে এবং এইসঙ্গে আলোচনাও চলছে যে ১৯৬২-র পর চীনের সঙ্গে এইরকম চূড়ান্ত সংঘর্ষ প্রথম ঘটলো। ভারতীয় সেনাদের শৌর্য ও সাহস নিয়ে এবং ভারতের বর্তমান নেতৃত্বের দৃঢ়তা ও সচেতনতার উপর কিছু লোক প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করাচ্ছেন। এইরূপ প্রশ্নকর্তাদের অতীত তলিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে এরা সব সেই লোকজন যারা বিজেপিকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসতে বাধা দিয়েছিল এবং নরেন্দ্র মোদীকে হারানোর জন্য প্রাণপাত পণ করে বসেছিল। বর্তমানের এইসব সমস্যার সৃষ্টি এই গোষ্ঠীর লোকেদের অদুরদর্শিতা, অবাস্তবতা, দুর্বল নেতৃত্ব ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের ধারণার অভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

সম্ভবত ভারতের শীর্ষ নেতৃত্ব যেরকম দৃঢ়তা, সাহস ও সংযমের পরিচয় ডোকলামে এবং এখন গলওয়ান এলাকায় দেখিয়েছেন, ইতিপূর্বে চীনের সঙ্গে এরকম কখনও ঘটেনি। ১৯৬২-র পরও চীনাদের আগ্রাসন চলছিলই, কিন্তু এর যোগ্য প্রতিরোধ আজ পর্যন্ত ঘটেনি। সেনাবাহিনীর শৌর্য ও সাহসের সঙ্গে নেতৃত্বের ভূমিকারও বিশেষ গুরুত্ব থাকে। ১৯৯৮-র সফল পোখরান পরমাণু পরীক্ষণ থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে, কারণ সেইক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নেতৃত্বের সিদ্ধান্তহীনতার ভূমিকা প্রধান ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ১৯৯৪ সালেই পরমাণু পরীক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু আন্তর্রাষ্ট্রীয় চাপের কাছে ওই সময়ের নতৃত্বের মধ্যে সেই সাহসের অভাব দেখা গিয়েছিল যা পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী দেখিয়েছিলেন। এই সফল পরীক্ষণের পর ভারত ও ভারতীয়দের গুরুত্ব বিশ্বে বেড়ে গেল। ২০১৪ থেকে রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদী গতিবিধি নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে এবং চীনের চোখেও ভারতের মনোভাবে এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা গেল। উরিকাণ্ডের জবাবে বিমান হামলা, বালাকোট, ডোকলাম, গলওয়ান এবং কাশ্মীরে উপস্থিত পাক-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদের সফল

প্রতিরোধ—এইসকল ক্রিয়াকলাপ থেকে এই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়েছে। আজ পর্যন্ত উপেক্ষিত ভারতীয় সীমান্তে দ্রুতগতিতে নির্মীয়মাণ উন্নয়নশীল কাঠামোর গঠন, প্রথমে পাকিস্তান এবং এখন চীনের দখলে থাকা আকশাই চীনের ভারতীয় ভূখণ্ড ফেরত নেওয়ার মানসিকতা এই দৃঢ়, সাহসিক এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের পরিচায়ক। চীনের বিচলিত হওয়ার কারণ এটা হতে পারে। অর্থাৎ এই কারণেই ভারতের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের সমর্থনকারীরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতীয় সেনার অতুলনীয় সাহস ও বলিদান সত্ত্বেও আমরা পরাজিত হয়েছি। এই ঘটনার দুটি কারণ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, এই সময়ের ভারতীয় শীর্ষ নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাব এবং দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত না থাকার মনোভাব। চীনের সম্প্রসারণশীল স্বভাবের সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী এবং অন্য অনেক দুরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, চীনকে ভাই-ভাই বলে আলিঙ্গন করলেও চীন ধোকা দিতে পারে, কিন্তু এই সতর্কবার্তাকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সুরক্ষার কোনোপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে এবং চীনের সঙ্গে গলাগলি করার পরিণাম স্বরূপ আমাদের ১৯৬২ সালের যুদ্ধে লজ্জাজনক ও দুখঃজনক পরিণাম ভুগতে হয়েছে।

এই ঘটনার পর ভারতীয় সৈন্যশক্তি সুগঠিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয় কিন্তু তা কার্যকর করা হয়নি। এরজন্য রাষ্ট্রনেতাদের পরিপক্কতা এবং দৃঢ়তা অত্যাবশ্যক। ২০১৩-র ৬ ডিসেম্বর. তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনির লোকসভায় বক্তব্য রাখার ভিডিয়ো সামনে এসে গেল। তিনি বলছেন, ‘‘ভারতের তুলনায় মৌলিক কাঠামোর নির্মাণের ক্ষেত্রে চীন অনেক উন্নত। ওদের মৌলিক কাঠামো এবং উন্নয়ন ভারতের থেকে উন্নততর। ....স্বাধীন ভারতে বহুবছর ধরে একটি নীতি চলে এসেছে যে সীমান্তে উন্নয়ন ও বিকাশ না করা সবথেকে ভালো সুরক্ষার রণনীতি বা কৌশল। অনুন্নত সীমান্ত উন্নত সীমান্ত থেকে বেশি সুরক্ষিত। এইজন্য কয়েক বছর ধরে সীমান্ত অঞ্চলে রাস্তা অথবা এয়ারপোর্ট নির্মাণ করা হয়নি। এই সময়ের মধ্যে চীন তাদের সীমান্ত অঞ্চলের মৌলিক কাঠামোর উন্নয়ন ও বিকাশ করে চলেছিল। এইজন্য পরিণামস্বরূপ, ওরা আমাদের থেকে এগিয়ে গিয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বুনিয়াদি কাঠামোর গঠন এবং ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের তুলনায় চীনারা এগিয়ে। আমি এই বক্তব্য স্বীকার করছি এবং এটি এক ঐতিহাসিক তথ্য।’’

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারতের বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষানীতি এবং আর্থিক নীতি ভুলপথে চালিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা নীতির বিশ্লেষণ উপরেই দেওয়া হয়েছে। আর্থিক নীতির প্রসঙ্গে বলা যায় যে, গ্রামভিত্তিক বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে শহরের উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থার প্রচলন হওয়ায় গ্রামাঞ্চল অনুন্নতই থেকে গেছে যেখানে ভারতের সত্তর শতাংশ মানুষের বসবাস। জনগণের ভালো শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য এবং রুজি রোজগারের সন্ধানে নিজ গ্রাম ছেড়ে দূর শহরে স্থানান্তরিত হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। এই নীতিগুলির জ্বলন্ত পরিণাম এখন করোনা মহামারীর সময়ে দেখতে পাওয়া গেল। রুজি রোজগারের জন্য অন্য রাজ্যে যাওয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে পালিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছে। রোজগারের জন্য নিজের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার ফলে এরা নিজের কাছে, নিজের বাস্তুভূমি থেকে এমনকী নিজ সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ভারতে সর্বাধিক রোজগার কৃষিকর্ম থেকে প্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী নীতির কারণে কৃষিকাজ ও কৃষকদেরই উপেক্ষা করা হয়েছে।

বিদেশনীতির কথা বললে জোটনিরপেক্ষতার কথা বলতেই হবে। তামাম

বিশ্বের সাপেক্ষে ভারতের স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত রণনীতির দৃষ্টিতে জোটনিরপেক্ষতার কৌশল যুক্তিযুক্ত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই নীতি আমাদের বিদেশনীতির চিরস্থায়ী পন্থা হতে পারে না, কেননা যে দুটি মহাশক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষতার কথা বলা হয় সেদুটি মহাশক্তির জাতীয়জীবন, তাদের কল্পনাপ্রসুত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে এতবেশি বিপরীত, অসম্পূর্ণ ও অপরিণত যে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের নীতি নির্ধারণ করার ভাবনাচিন্তা নিজের মধ্যে দাসত্ব মানসিকতার দিক নির্দেশ করে। আমেরিকা ও সেই সময়ের রাশিয়া যারা এই মহাশক্তির কেন্দ্র ছিল তাদের জাতীয় জীবন পাঁচশো বছরও হয়ে ওঠেনি। যে চিন্তনের সাপেক্ষে তারা এর দোহাই দিত তাদের একশো বছরেরও অভিজ্ঞতা ছিল না। অন্যদিকে ভারতের ইতিহাস, জাতীয় জীবন কমপক্ষে দশ হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন।

অধ্যাত্মভিত্তিক ভারতীয় জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি একাত্ম, সর্বাঙ্গীণ ও বিশ্বজনীন। এই কারণেই সমর্থসম্পন্ন হয়েও ভারত কখনও অন্যদেশের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। ব্যবসার জগতে সুদুর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে থাকলেও ভারত কখনও কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করেনি। কোনো প্রকার শোষণ করেনি। কখনো লুণ্ঠনও করেনি। কখনো তাদের ধর্ম পরিবর্তনও করেনি। আমাদের লোকেরা তাদের সম্পদশালী করেছে, সমৃদ্ধ করেছে এবং সুসংস্কৃত করেছে। ভারতের এই প্রাচীন সবার্থসাধক বিশ্বদৃষ্টিই দুনিয়াতে ভারতকে স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে। তার ফলস্বরূপ এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের বিদেশনীতির ভিত্তিও হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু ভারতের প্রথম প্রধনামন্ত্রীর উপর সাম্যবাদের ভর হয়েছিল। এরফলে ভারতের অধ্যাত্মভিত্তিক বিশ্বজনীন, সর্বাঙ্গীণ এবং একাত্মতার দৃষ্টিভঙ্গিকে এড়িয়ে আধুনিকতার নামে চিত্তাকর্ষক পশ্চিমি শব্দাবলীর জালে আবদ্ধ হয়ে ভারতের নীতির দিশা পালটে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মধ্যে সাম্যবাদীদের প্রভাব বাড়ছিল এবং পরিশেষে কংগ্রেসিরা সম্পূর্ণরূপে সাম্যবাদীদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, পরিণামস্বরূপ ভারতের ভারতীয়ত্ব থেকে ক্রমশ দুরত্ব বাড়তে থাকে। ভারত এবং ভারতের যে সত্তা বা পরিচিতি যা দুনিয়া সুদীর্ঘকাল ধরে জেনে এসেছে সেই পরিচয়কে অবজ্ঞা করে নিজেকে প্রগতিশীল, লিবারেল, ইনটেলেকচুয়াল ইত্যাদি বলে জাহির করার ফ্যাশন দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু সমাজে অবিরতভাবে চলে আসা সামাজিক এবং জাতীয় গণজাগরণের ফলে ২০১৪ সালের নির্বাচনে এক অকংগ্রেসী পক্ষ স্বাধীনতার পর প্রথমবারের জন্য পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে শাসন ক্ষমতায় আসীন হলো। শুধু তাই নয়, এই গণজাগরণ সমস্ত দেশজুড়ে ওই সক্রিয় সমাজেরই জয় যার নিজ ঐতিহ্যের সঙ্গী হয়ে আপন সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমার্জিত করে দেশব্যাপী পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে এবং প্রগতিশীলতার নামে ঔপনিবেশিক ভাবধারাকে ভারতীয় সমাজে জুড়ে-দেওয়া সমর্থকদের নসাৎ করে দিয়েছে। ২০১৯-এ আরও বেশি করে জনসমর্থনের মধ্য দিয়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। এটাই ২০১৪-র আগে পরিবর্তনের বিন্দুর ছিল।

২০১৪-র ১৬ মে লোকসভা নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা হলো এবং নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রাষ্ট্রীয় জনগণতান্ত্রিক জোটকে (এনডিএ) সরকার গঠনের আহ্বান করা হলো। ১৪ই মে 'সানডে গার্ডিয়েন'-এর সম্পাদকীয়তে মুখবন্ধ ছিল ''আজ ১৪ মে ২০১৪, ইতিহাসের সেইদিন হিসাবে গণ্য করা হবে যে, ব্রিটেন অবশেষে ভারত ছাড়লো। নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর বিজয় এক দীর্ঘযুগের সমাপ্তি ঘটানোর ইঙ্গিত দিল, যাদের শাসন ব্যবস্থা ও চিন্তাধারা মোটেও ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন থেকে অভিন্ন ছিল না। কংগ্রেস পার্টির অধীনে ভারত অনেক ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ রাজের ধারাবাহিকতাই ছিল।'' সম্পাদকীয়র এই শুরুটাই এই পরিবর্তনের মূল বর্ণনা ছিল।

এই সময়েই শিব বিশ্বনাথনের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখনটিতে লেখক এক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেছেন। এর শিরোনামই সমস্তকিছু প্রকাশ করে দিয়েছে। শিরোনাম ছিল 'মোদী আমার মতো লিবারেলস-কে কীভাবে পরাজিত করলো।' শিব বিশ্বনাথন লিখেছেন 'সেকুলারিজম' এমনভাবে বিরোধী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের মতামত, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্বন্ধে লজ্জিত এবং দোদুল্যমানের শিকার হয়ে উঠেছে। সেকুলারিজম এমন চমকদার ও ছিন্নমূল, যা আলোচনায় সঙ্কুচিত ও বিমর্ষ হয়ে থেকে যায়, যেখানে মধ্যবিত্তরা নিজেদের কখনই সহজ হতে পারতো না।

১৭ মে নরেন্দ্র মোদী পুনরায় কাশী গিয়েছিলেন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা দেন। মন্দিরে পূজা অর্চনার পর তিনি দশাশ্বমেধ ঘাট গিয়েছিলেন যেখানে নদীতীরে আরতি করা হয়েছিল। .... এসমস্তই টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল। জনগণ চাইছিল যে এই ঘটনাটা পূর্ণরূপে এবং কোনোপ্রকার মন্তব্য ছাড়াই যেন দেখানো হয়। অন্যদিকে কিছু লোক এমন মতামতও দিয়েছে যে এই প্রথম হলো যখন এরূপ কোনো অনুষ্ঠান খোলাখুলিভাবে দেখানো হয়েছে। মোদীর উপস্থিতি র স্পষ্ট বার্তা ছিল —'আমাদের নিজ ধর্মের জন্য লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন নেই'। এসব আগে হতেই পারতো না।

প্রথমে আমি এরজন্য বিরক্ত হয়েছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই ভাবনায় ডুবে গিয়েছিলাম। আমার এক সহযোগী মন্তব্য করেছিল 'আপনারা ইংরেজি বোলনেওয়ালা সেকুলারবাদীরা জনগণের সঙ্গে জোর জবরদস্তি করেন যার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠরা লজ্জিত হয়।' অবশ্যই মন্তব্যটি তীব্র এবং ঝাঁকুনি দেওয়ার মতো ছিল, কিন্তু আমার মুহূর্তে মনে হয়েছিল আমার মতো উদারবাদী এত বড়ো কথা বলার জন্য অপরাধীও হতে পারে। এই নতুন ভারত, যার উপলব্ধি সব ভারতবাসী এবং সমগ্র বিশ্ব অনুভব করতে পারছে। কিন্তু বাস্তবে এই চেতনা একেবারেই নতুন নয়, বরং আজ পর্যন্ত স্বীকার করাই হয়নি, চেপে রাখা হয়েছিল। মিথ্যাচারের জন্য বহুবছরের প্রাচীন কিন্তু নিত্য নতুন এবং চিরপুরাতনের পরিচিতি নিয়ে স্বাভিমান এবং দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে অছে এই আমাদের ভারত এবং এই জন্যই ভারতের মানসিকতায় রয়েছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এবং 'সর্বেপি সুখিনঃ সন্তু'। এই আত্মীয়তাবোধ এবং আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে দৃঢ় থাকায় কোনো প্রকার ভয়ের উদ্রেক করে না। কারণ এটাই যে ভারত আবার জেগে উঠেছে।

করোনা মহামারীর মতো সংকটে যখন সারা দেশে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে সেই সময় সম্প্রসারণবাদী ও সর্বগ্রাসী আধিপত্যবাদী চীনের দ্বারা আবার সৃষ্টিকরা দ্বন্দের মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভারতীয় সমাজকে এক থাকার সংকল্প দেখাতে হবে এবং সেই অনুভব দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং রণনীতির জন্য সেনা এবং সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রেখে দেশের সমস্ত নাগরিক ও দলগুলির আবারও রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এইসময় রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতি অথবা একে অপরের হার-জিত নির্ণয়ের সময় নয়।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ)

(ভাষান্তর ঃ দেবযানী ঘোষ)

বিশেষ নিবন্ধ

সান জু, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও তিব্বত

প্রবাল

সান জু (সঠিক উচ্চারণ সূন জু) প্রাচীন চীনের একজন প্রবাদপ্রতিম দার্শনিক ও যুদ্ধবিশারদ। কমিউনিস্ট চীন তাঁর লেখা 'আর্ট অব ওয়ার' বইটা বেদবাক্য মানে।

বইটা সবার পড়া উচিত। বিশেষ করে আমাদের ভারতীয়দের। আমাদের দোষ, আমরা সবাইকে নিজের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখি। 'মানবধর্ম' নামক আকাশ কুসুমে বিশ্বাস রাখি। সত্যিটা হলো, প্রতিটি জাতি তার নিজের মতো করে ভাবে। একজনের কাছে যেটা অভদ্রতা, অন্যজনের কাছে সেটাই হয়তো ভদ্রতা। তার ভাবনাটা বুঝতে না পারলে তার সঙ্গে বন্ধুত্বও সম্ভব নয়, ভালো করে শত্রুতাও সম্ভব নয়। সান জু-র দুটি শিক্ষা তাই এখানে উল্লেখ করলাম—

(১) প্রতিস্পর্ধীর শক্তি যদি তোমার শক্তির তুলনীয় হয়, তাহলে বন্ধুত্বের পথ খোঁজো। আর যদি প্রতিস্পর্ধীর শক্তি তোমার শক্তির অর্ধেক হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় যুদ্ধের ফিকির খোঁজো।

(২) তোমার ক্ষমতাকে অক্ষমতার আবরণ দিয়ে ঢাকো, অক্ষমতাকে ক্ষমতার আবরণ দিয়ে।

প্রথম বিন্দুটির মানে কী দাঁড়ালো? চীনের সঙ্গে শান্তির একটাই উপায়, চীনের থেকে বেশি শক্তিশালী হওয়া। দ্বিতীয় বিন্দুটির মানে কী? যদি চীন বলে, আমি তোমাকে আক্রমণ করতে পারি, এক সপ্তাহে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারি, বাষট্টি সালে আমরা হেই করেছিলাম হুই করেছিলাম, জানবেন চীন তার অক্ষমতাকে ঢাকবার চেষ্টা করছে। সম্মুখ সমরে ভারতের সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা ওদের নেই। চীন যেটা বলছে না, ভয় সেখানে। চীন বলছে না, ভারতের মধ্যে ওদের প্রভাব কতটা। কাকে কাকে ওরা কিনে রেখেছে। ক'টা খবরের কাগজ ও টিভি চ্যানেল ওদের পয়সায় চলে। বলিউডের ক'টা সিনেমা ওদের টাকায় তৈরি। হিমালয়ের সীমান্ত ধরে দুই দেশের সেনা এখন দাঁড়িয়ে আছে, চোখে চোখ রেখে। দু'জনের শক্তি তুলনীয়। তাই সান জু-র নিয়মানুসারে, যুদ্ধ হবে না। যদি না...ভারতের অভ্যন্তরে গোলমাল বাধে, যার ফলে ভারতীয় সেনার একটা অংশ সেই গোলযোগ সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বুঝহ লোক, যে জানে সন্ধান!

আমরা আমাদের মতো করে শত্রুকে দেখি, সেটা ভুল। একই ভুল সম্ভবত চীনও করেছে। ওরা ভেবেছিল, আমরা সান জু-কে মানি। তিনশো সৈন্য নিয়ে ত্রিশজন ভারতীয় সৈন্যকে আক্রমণ করলে ভারতীয়রা পালাবে। আত্মসমর্পণের পথ খুঁজবে। ওরা জানতো না, ছোটোবেলা থেকে সান জু নয়, মহাভারত পড়ে বড়ো হয়েছি আমরা। অভিমন্যু আমাদের রক্তে। ভারতের ত্রিশজন যোদ্ধা চীনের তিনশো যোদ্ধার সঙ্গে বীরবিক্রমে লড়ে প্রভূত হানি ঘটিয়েছে। মারতে মারতে মরেছে, মরতে মরতে মেরেছে। প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ বাঁচিয়ে পালায়নি। এমনটা হবে জানলে চীন নিশ্চয়ই এতবড়ো ভুল করত না। সেনাপতি ঝাও জংকি নাকি বলেছিলেন, ইন্দুগুলোকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে, তবেই আমেরিকা আমাদের ভয় পাবে। হায় রে! আমাদের শিক্ষা দিতে এসেছিল, নিজেরাই শিক্ষা পেয়ে মুখ পুড়িয়ে ফিরে গেল। এখন আমেরিকাকে ভয় দেখাবে কী করে? চীনের আজ সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো ওদের 'এক সন্তান' নীতি। এই নীতির কালে যে শিশুরা জন্মেছিল, তারাই এখন লালফৌজের সেনানী। বেশিরভাগই আলালের ঘরের দুলাল। তারা লড়বে ভারতীয় সেনার সঙ্গে?

বাঘ হলো বাস্তব। ড্রাগন? কল্পনা, ফানুস!

সাম্প্রতিকালে চীনের এক সামরিক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সাবধান হওয়া উচিত ভারতের! চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধালে পাকিস্তান ও নেপাল যোগ দেবে চীনের পক্ষে। ত্রিমুখী আক্রমণ সামলাতে পারবে না ভারত। ভেবে দেখুন, যে বিশারদ কথাটা বলেছেন, তিনি নিশ্চয়ই সান জু-র উপদেশ মেনেই বলেছেন। তার মানে, এটা চীনের শক্তি নয়, দুর্বলতা। চীন ভয় পাচ্ছে, যুদ্ধ বাধলে ভারতের পক্ষে যোগ দেবে জাপান, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম ও আমেরিকা। হয়তো-বা অস্ট্রেলিয়াও। রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকবে। চীনের পক্ষে কে যোগ

দেবে? পাকিস্তান ও নেপাল! তাতে চীনের লাভ না ক্ষতি, সেটা তারাই ভালো বলতে পারবে!

নেপাল! আমাদের নিজেদের রক্ত , এভাবে শত্রুতা শুরু করেছে, ভাবাই যায় না। সম্প্রতি একটা বই পড়ছি। ভারতের গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর প্রতিষ্ঠাতা আর এন কাও-এর জীবনী। কাও কীভাবে নিঃশব্দে অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে সিকিমের ভারতে বিলয় ঘটিয়েছিলেন, সেটা পড়তে পড়তে ভাবছিলাম, এমনটা নেপালের ক্ষেত্রে করা যেত না কি? তাতে নেপালের জনগণ উপকৃতই হতো। শুনেছি ভারতের স্বাধীনতার পর তারা ভারতে যোগ দিতে চেয়েছিল। যেমনটি চেয়েছিল মরুতীর্থ বালুচিস্তান। কিন্তু চাচা নেহরুর মত ছিল না! বিহার রেজিমেন্টের বীর সেনারা যেভাবে চীনা সেনাদের ঠ্যাঙ্গানি দিয়েছে, সেই খবর শত চেষ্টাতেও ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। গর্ব হচ্ছে, বিহার আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য। কিন্তু একটা দুঃখও হচ্ছে। ভারতীয় বাহিনীতে বিভিন্ন আঞ্চলিক রেজিমেন্ট আছে। বিহার রেজিমেন্ট, মারাঠা রেজিমেন্ট, নাগা রেজিমেন্ট। বেঙ্গল রেজিমেন্ট আগে ছিল, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ এই রেজিমেন্ট থেকেই শুরু হয়েছিল। সেই রেজিমেন্ট এখন আর নেই। ইংরেজ বলত, বাঙ্গালি বীর জাতি নয়, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর হবে না! বুড়িবালাম ও চট্টগ্রামে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, বীর বাঙ্গালি কাকে বলে। আমাদের বীরত্বে ভয় পেয়ে ইংরেজ এদেশে কমিউনিজম আমদানি করেছিল। যাতে দাস ক্যাপিটাল পড়ে আমাদের দাসভাব বাড়ে, বীরত্ব কমে। কমেনি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার প্রমাণ রেখেছি। তারপরেও কেন বেঙ্গল রেজিমেন্ট নেই? বলবেন, আঞ্চলিক রেজিমেন্ট তৈরির নীতি ভুল, সেটা ইংরেজ করেছিল আমাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবার জন্য। মানলাম! তাহলে এখন সবকটা রেজিমেন্ট একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হোক না কেন? এক্ষুনি সেটা সম্ভব নয়, তাই না? কবে সম্ভব হবে, সেটাও কেউ বলতে পারে না। তাহলে বেঙ্গল রেজিমেন্ট হতে বাধা কোথায়? হুংকারে 'জয় মা কালী', কপালে রক্ততিলক, বেঙ্গল রেজিমেন্ট কাঁপিয়ে বেড়াক হিমালয় থেকে সুন্দরবন! প্রতাপাদিত্যের চূড়াইল মাঝিদের রক্ত বইছে আমাদের ধমনীতে। মোগল ঠেঙিয়েছি আমরা। পোর্তুগিজদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছি। তাই তো পোর্তুগিজরা যে ইনকুইজিসন পশ্চিম ভারতে করতে পেরেছিল, সেটা এদিকে করার সাহস পায়নি! সেই আমরা বীর নই? এই মিথ্যে কলঙ্ক আর কতদিন বয়ে বেড়াতে হবে?

পরিশেষে বলি, তিব্বতের সঙ্গে বাঙ্গালির একটা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। অহিংসা পরম ধর্মের ফল তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ বলে, জমির টুকরো নিয়ে এই হানাহানি কী অন্যায়! তাদেরও তিব্বতে গিয়ে থাকা উচিত। বর্তমান বাংলা হরফের আদি রূপ 'সিদ্ধম' হরফ। তিব্বতীয় হরফেরও আদি রূপ 'সিদ্ধম'। একই ভাষা, একই পরম্পরার আমরা উভয়েই উত্তরসূরি। আমাদেরই ঘরের ছেলে, ঢাকা বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামের সন্তান অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু। আমাদের তন্ত্রশাস্ত্র আত্মস্থ করে তিব্বত এক নতুন ধর্ম নির্মাণ করেছে, বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম। সেই তিব্বতীয়রা আজ বড়ো কষ্টে রয়েছে। স্বাধীনভাবে কিছুই করার অধিকার নেই তাদের। নিজেদের দেশটাও আর নিজেদের নেই। লক্ষ লক্ষ হান বংশীয় তিব্বতীয় ভাই-বোনেদের কথা ভুলে যাবেন না। পারলে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবেন তাদের জন্য। আর মনে রাখবেন, আজ রুখে না দাঁড়ালে আগামীকাল আমাদের অবস্থাও তিব্বতীয়দের মতোই হতে পারে। ■

অতিথি কলম

হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা

ভারত বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কীভাবে মেকাবিলা করছে

গত ৬ মাসের বেশি সময় ধরে বিশ্বকে ত্রাসের শিকার করে রাখা করোনা মহামারী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানব সভ্যতার ওপর সর্ববৃহৎ আক্রমণ। ইতিমধ্যেই ৫ লক্ষ মানুষের এর আক্রমণে মৃত্যু ঘটেছে ও অজস্র মানুষ তাদের জীবিকা হারিয়েছে। অর্থনীতির ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব বিধ্বংসী। চলতি ২০২০ সালের অর্থবর্ষে বহু আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলি সমগ্র বিশ্বের উৎপাদন হার ৫ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে আগাম অনুমান প্রকাশ করেছে। এর টাকার অঙ্কে পরিমাণ দাঁড়াবে বিশ্ব জিডিপি-র ১২ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার পরিমাণ ক্ষতি।

আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (ইন্টারন্যাশানাল মনিটারি ফান্ড) এই মহামারীকে 'দি গ্রেট মনিটারি লকডাউন' আখ্যা দিয়ে বলেছে— বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুত্থান নির্ভর করবে কত দ্রুত এই মহামারীকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। এই মুহূর্তে ভারত দেশজুড়ে যে লকডাউন চালু রেখেছিল তাকে শিথিল করার দ্বিতীয়পর্ব 'আনলক টু' শুরু হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সুচারু রূপে চালু করা। তবে সরকার সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছে যে, এই জরুরি কাজ করতে গিয়ে মহামারী নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে যেন ঢিলে না পড়ে।

একথা বলতেই হবে যে, মহামারী উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার মোকাবিলা ও পরিত্রাণ সরকার সর্বদাই পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন করে যথাসম্ভব নাগরিকদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। নাগরিকের জীবন-জীবিকা সর্বদাই সরকারের অগ্রাধিকারে থেকেছে। এর প্রমাণ হিসেবে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দেশে দ্রুত বাড়লেও সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মৃত্যুর হারে আমরা অনেকটাই আশাব্যঞ্জক স্থানে রয়েছি। একই সঙ্গে আক্রান্তদের সেরে ওঠার হারও

> **জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সেই সংক্রান্ত সরবরাহ শৃঙ্খল অটুট রাখতে ভারত সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিদেশমন্ত্রক ও তার কূটনীতিকরা সারা বিশ্বকে সফলভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে কোনো নতুন আবিষ্কার ও তাকে উৎপাদনে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে ভারত উপযুক্ত লক্ষ্য হওয়ার যোগ্যতাধারী।**

আমাদের দেশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো। সময় থাকতেই ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি আন্দাজ করে নাগরিকদের জীবন নিরাপদ করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা (লকডাউন) নেওয়াই এর কারণ। সরকার তার অর্থভাণ্ডারের বড়ো অংশই নাগরিক স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ, চালু হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, করোনা চিকিৎসাকেন্দ্র ব্যাপক সংখ্যায় তৈরি করা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা বর্ম (পিপিই কিট) এবং একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে করোনা চিকিৎসা করার যোগ্য করে তোলা সব ক্ষেত্রেই সরকার অতি তৎপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া বিপুল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সময়োপযোগী পরিকল্পনা নিয়ে নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎমুখী 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর বহুমুখী রূপরেখার কল্পনা সঠিক শুধু নয়, একমাত্র বিকল্প। ২০ লক্ষ কোটি টাকা সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার খাতে বরাদ্দ হওয়া সমাজের সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত ও সহজেই দুর্গতির কবলে পড়া মানুষদের জন্য একটি অতি শুভ প্রকল্প। বস্তুত আত্মনির্ভর ভারতের সাফল্য দাঁড়িয়ে থাকবে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর--- (১) অর্থনীতি, (২) পরিকাঠামো, (৩) টেকনোলজি, (৪) ভৌগোলিক অবস্থান এবং (৫) চাহিদা তৈরির ওপর।

এই আত্মনির্ভরতার অভিযান কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যে করোনা মহামারী থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ নির্দেশ নয়। সামগ্রিক শিল্প ও বাণিজ্য মহলে

আত্মবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করা, আমাদের উৎপাদিত পণ্যকে বিশ্বের যে কোনো দেশের সঙ্গে গুণমানে ও মূল্যায়নে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন বিশ্বের সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত করে কৃষককে বর্ধিত লভ্যাংশ পাওয়ানো। দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগের জন্য বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তি আনার পথ সুগম করা। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত অর্থনৈতিক সাহায্য ও পরিকল্পনাগুলির কারণে যে পরিমাণ খরচ হবে তা ভারতের সামগ্রিক জিডিপি-র শতকরা দশ শতাংশ বলে জানানো হয়েছে।

আত্মনির্ভর ভারতের ডাক দেওয়ার মানে এই নয় যে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দেশকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া। উলটে এর অর্থ বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে ভারতের আরও বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ। নিজের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করার অর্থ বিশ্ব রপ্তানি ব্যবস্থায় আরও সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে ওঠা যাতে সরবরাহ শৃঙ্খলে অকিঞ্চিৎকর হয়ে না থাকতে হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু নজর রাখতে হবে কী ধরনের পণ্য উৎপাদনে ভারতের দক্ষতা ও সুবিধে বেশি। সেগুলিকে চিহ্নিত করে সফলভাবে উৎপাদন বাড়াতে পারলে অনায়াসে বিশ্ব সরবরাহকারী হিসেবে উঠে আসা যাবে। এটা নিশ্চয় সত্যি আমরা সবকিছু নিজেরা তৈরি করতে পারব না কিন্তু আমরা অনেক কিছুই তৈরিতে সক্ষম যা আমরা এখন করছি না।

এই সূত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রকে ৮টি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হবে। (১) কয়লা, (২) অন্যান্য খনিজ দ্রব্য, (৩) প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন, (৪) অসামরিক বিমান পরিবহণ, (৫) বিদ্যুৎ সরবরাহ, (৬) সামাজিক পরিকাঠামো, (৭) মহাকাশ, (৮) পারমাণবিক শক্তি। সরকার বেসরকারি উদ্যোগে কিছু গন্তব্যে ট্রেন চালানো ও রেলওয়ে স্টেশনগুলির মান উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তাদের আহ্বান করার পরিকল্পনা নিয়েছে। ১৫০টি রুটও ঘোষণা হয়ে গেছে। করোনা আক্রমণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী দেশগুলি এর প্রতিষেধক বা চিকিৎসা উদ্ভাবনে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই ভারত বিশ্ব নেতাদের একত্র করে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে। প্রত্যেকটি দেশই যে একই মানবতার অংশীদার ও ফলভোগী সেই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর আপ্ত বাক্য মোদী অত্যন্ত কুশলতার ১২০টি দেশকে ওষুধ সরবরাহ করে সফলভাবে বোঝাতে পেরেছেন।

এই মহামারীর প্রকোপে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বের জননেতাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎকার ও মতবিনিময়ের জন্য বিভিন্ন সম্মেলন ও সফর সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া পারস্পরিক বিবাদ বা সম্পর্কের তিক্ততার ক্ষেত্র তৈরি হলে সেখানে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অনেক সমস্যার চটজলদি সমাধান বেরিয়ে আসত। এখন সেটা হচ্ছে না। কিন্তু সমস্যার হাল করতে কূটনৈতিক স্তরে মতবিনিময় থেমে থাকতে পারে না। বিশ্বের নানা প্রান্তে বিশেষ করে ভারত ও চীনের মধ্যে লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল নিয়ে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে উভয় দেশের মধ্যে —পারস্পরিক আলোচনার অপরিহার্যতাকে তা আবার প্রমাণ করছে। আলোচনা চালাতেই হবে, কূটনীতির অত্যাধুনিক পথসন্ধান করে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই হবে। মুখোমুখি দেখা না হলেও ভার্চুয়াল ডিপ্লোমেসি'র সফল প্রয়োগের ফলে বিশ্বের ৮৯টি দেশে ৮২ কোটি টাকা মূল্যের ওষুধ, করোনার টেস্ট কিট, প্রতিরক্ষা বর্ম ইত্যাদি ভারত থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয়, এই বিপদের সময়েও ভারত কিন্তু তার ঘোষিত আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা মেটাতে কোনো খামতি করেনি।

জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সেই সংক্রান্ত সরবরাহ শৃঙ্খল অটুট রাখতে ভারত সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিদেশমন্ত্রক ও তার কূটনীতিকরা সারা বিশ্বকে সফলভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে কোনো নতুন আবিষ্কার ও তাকে উৎপাদনে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে ভারত উপযুক্ত লক্ষ্য হওয়ার যোগ্যতাধারী। আমি নিশ্চিত এই প্রচেষ্টা দেশকে সর্বস্তরে শক্তিশালী করবে এবং আমরা আমাদের লক্ষ্যে করোনার চ্যালেঞ্জকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাব।

(লেখক ভারত সরকারের বিদেশ সচিব)

R. K. WIRE PRODUCTS LTD.

Manufacturers of Wire and Wire Products

Office : Unit No-VII, 15th floor, Tower-I
PS Srijan Corporate Park
Plot No. G-2, Block-EP & GP, Sector-V
Salt Lake City, Kolkata-700 091
(West Bengal) India

বাঙ্গালির হাত ধরে ওঠা বলিউড চিরকাল বাঙ্গালি বিদ্বেষী

সুষমা শ্রীবাস্তব

ভারতে চলচ্চিত্রের সূচনা পর্বের দিকে একটু চোখ রাখা যাক। তাঁর আগে বলে নেওয়া যাক একটু বাস্তব চিত্র। বর্তমানে বলিউড বেশ খানিকটা অন্য প্রদেশ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্বেষী। বলতেই পারেন, অনেকেই গিয়ে আজ রাজ করছেন, সেই অতীত থেকে যেমন করে এসেছেন। বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে অগ্রণী পরিবার গাঙ্গুলি পরিবার। অশোক কুমার, কিশোর কুমার থেকে হৃষীকেশ মুখার্জি, শক্তি সামন্ত থেকে বসু চ্যাটার্জি, আবার সুজয় ঘোষ থেকে সুজয় সরকাররাও আছেন এই লিস্টে। বাঙ্গালি অভিনেতার নাম যদি বলা যায়, তাহলে বলা যাবে, বিশ্বজিৎ বা কাজল বা রানি বা রাখি গুলজার এরা তো আছেন। তবে বাঙ্গালিদের একটু ঘেঁষতে না দেওয়ার বিষয়টা আসছে কোথায়?

২৪ জুলাই, আমাদের মহানায়ক, উত্তমকুমারের চিরতরে চলে যাওয়ার দিন। এই সময়ে একটু পিছন ফিরে দেখতে ইচ্ছা করছিল, তাই এই কথাটা এল। প্রসঙ্গত, সুশান্ত সিংহ রাজপুতের ঘটনাও এই শব্দটা আসার পিছনে রয়েছে। কেননয়া এই সুশান্ত সিংহ রাজপুতের ১৪ জুন নিজেকে নিজে শেষ করে দেওয়ার পিছনে একটি শব্দ বারে বারে উঠে এসেছে, স্বজন পোষণ, আরেকটি শব্দ অলক্ষ্যে রয়ে গেছে, সেটি হলো বলিউডি নোংরা লবিবাজির রাজনীতি।

ফিরে যাওয়া যাক একটু পিছনে। এখন সামনে যখন আসছে, করণ জোহর, চোপরা পরিবারের নাম। একটা সময়ে এই নামগুলো জায়গায় ছিল কাপুর পরিবারের নাম, সাগর পরিবারের নাম। সেই সময়ে চোপরারা একটু পিছনের সারিতেই ছিল। মধ্যখানে যখন বলিউডে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের টাকা বিনিয়োগ হতো তখন আবার দাউদ বা এরকম কোনো দুবাই ভিত্তিক ডনেদের একটা প্রভাব কাজ করত গোটা হিন্দি ছবির জগতে।

একটু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ভারতে চলচ্চিত্রের সূচনা হয়েছিল এই বাঙ্গলা থেকেই। বলা যেতে পারে আমাদের টালিগঞ্জ থেকে। সেই ১৮৯০ সাল থেকে যখন কলকাতার থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানো হতো। এক দশকের মধ্যেই ইন্ডাস্ট্রির বীজ বপন করেন হীরালাল সেন। তিনি রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে কলকাতার স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার ইত্যাদিতে জনপ্রিয় শো দেখাতেন। বেশ অনেকদিন পর সেই অর্থে সিনেমা শিল্পের হাল ধরেন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। তিনি ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যা বাঙ্গালি মালিকানার প্রথম কোম্পানি (১৯১৮)। প্রথম বাংলা ফিচার ফিল্ম ছিল বিল্বমঙ্গল, যেটি ১৯১৯ সালে ম্যাডন থিয়েটারের ব্যানারে নির্মিত। প্রথম সবাক চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ১৯৩০-এর শুরুর দিকে। অবশ্য এর মধ্যেই ১৯১৩ সালে প্রযোজক ও পরিচালক দাদাসাহেব ফালকের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে বলিউড। সে বছর ৩ মে তাঁর পরিচালিত প্রথম ভারতীয় ছবি রাজা হরিশ্চন্দ্র মুক্তি পায় করোনেশন সিনেমায়। ছবিটি ছিল নির্বাক। এমনকী কাপুর পরিবারের ছবির জগতে হাতেখড়ি হয়েছিল এক কলকাতায় বাঙ্গালিদের হাত ধরেই। আর সেই অর্থে বাণিজ্যিক হিন্দি ছবির জনপ্রিয়তা সেও ওই কাপুর পরিবারের হাত ধরেই। শোনা যায় এই কাপুর পরিবার ছিল বাঙ্গলা থেকে যাওয়া অভিনেতাদের বিরোধী। অন্যদিকে, এরাই চালু করেন পরিবার ও স্বজনপোষণের বিষয়টা তবে থাক সেকথা। বাজার ধরার প্রতিযোগিতায়, হিন্দিবলয়ের প্রাধান্যের কারণে বাংলা ছায়াছবির সেই অর্থে আটকে যায় আঞ্চলিকতায়। তা সত্ত্বেও বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে সুনাম পেতে থাকে নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে।

ফিরে আসি লবিবাজির কথায়। উদাহরণ হিসাবে মহানায়ক উত্তমকুমারের কথাই আসা যাক। অনেকেই সেই সময়ে বলিউডে কাজ করে ফেলেছেন। তবে লবিতে পড়তে পারেননি বলে কল্কে পাননি। মূলত অনেকেই বলেন সেই সময়ে কাপুরদের প্রভাবে বাঙ্গালিদের জায়গা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকী মহানায়ক যখন প্রযোজক হিসাবে এলেন, তাঁর প্রযোজনার জন্য টাকা জোগাড় করতে পারেননি এই লবির জন্য। এমনকী তাঁর রাস্তায় থাকার মতো অবস্থা হয়েছিল। ছিল না খাবার টাকাও। সেই কথা তিনি ব্যক্তিগত চিঠিতে স্ত্রী গৌরীদেবীকেও জানিয়েছিলেন। এমনকী এও বলেছিলেন, খাবার টাকা জোগাড় করার জন্য তিনি অনেকের কাছে কাজের কথাও বলেছেন। কিন্তু কাজ পাননি। কেন পাননি? তাঁর কি অভিনয়যোগ্যতা ছিল না? সে প্রশ্ন তোলা থাক। যখন বাঙ্গলায় মহানায়কের স্বর্ণযুগ, সেই সময়ে যদি লক্ষ্য করা যায় মুম্বাইয়ের একমাত্র শক্তি সামন্ত তাঁকে নিয়ে দ্বিভাষিক ছবি করেছেন। বলিউডে তাঁর ঝুলিতে সেই অর্থে তিনটি ছবিতে অভিনয়— 'দেশপ্রেমী', 'ছোটিসি মুলাকাত', আর 'মেরা করম মেরা ধরম'। বুঝুন, একজন মহানায়ককে কেমন মানসিক যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছিল। সেই সময়ের একটি সূত্র মারফত সেই লবির একটি ছবি পাওয়া যায়। সঞ্জিবকুমার লবি, চোপরা লবি, কাপুর লবি, আর রাজনৈতিক দিক দিয়ে কংগ্রেস ও দক্ষিণ ভারতীয় লবি। তবে সবছেয়ে বড়ো লবি ছিল, প্রবাসী বাঙ্গালি অভিনেতা লবি। এরা এদের জায়গা যাতে নষ্ট না হয়, সে কারণে সেদিনও বাঙ্গালিদের বলিউডে ঢুকতে বাধা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য সেই ধারায় চলে এসেছে সলমন খান লবি, আমীর খান লবি, করণ জোহর লবি সমেত একাধিক লবি। তাই শাহরুখ খানরা কাজ পায় না সেরকম। এই লেখায় নায়িকাদের কথা বাদ রাখলাম। অন্য কোনো সময় বলা যাবে। এত গেল বলিউডের কথা। টলিউডেও আছে এরকম লবি। তবে সেটা রাজনৈতিক লবি। সেটাও বলা যাবে আরেকটি লেখায়।

বাংলাদেশে বাউল ও লোকগানের জগৎ কি সংকুচিত হচ্ছে?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন পূর্ববঙ্গে জমিদারি তদারকিতে এসে লালন সাঁইকে আবিষ্কার করেছিলেন। আজ সেই পূর্ববঙ্গ স্বাধীন বাংলাদেশ। পাকিস্তানের দ্বিজাতি তত্ত্বকে পরাজিত করে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। তাঁর গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবনে বাউল গানের প্রভাব এক নতুন ধারা রচনা করে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে নতুন অভিজ্ঞতা হতো, যে দেশে লালন আবিষ্কৃত হয়েছিলেন, সে দেশে লালনের উত্তরসূরিদের জগৎ ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। বাউলরা, লোকগানের শিল্পীরা ভালো নেই। দিনদিন তাদের উদ্বেগ-শঙ্কা বাড়ছে। তাদের মধ্যে অস্তিত্ব সংকট প্রকট হচ্ছে।

ইসলাম রক্ষার নামে বাংলাদেশে বাউল ও অন্যান্য লোকগানের শিল্পীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সম্প্রতি শরিয়ত সরকার বয়াতি নামে এক বাউল কবিগানের আসরে ইসলামের ‘উদার দিক’ তুলে ধরতে গিয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় বলা হয়েছে, এই বয়াতি ঢাকার ধামরাইয়ে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, গান-বাজনা হারাম বলে ইসলাম ধর্মে কোনো উল্লেখ নেই। কেউ প্রমাণ দিতে পারলে তিনি গান ছেড়ে দেবেন।

বয়াতির সেই বক্তব্য ইউটিউবে প্রচারিত হয়। আর ইউটিউবে সেই বক্তব্য দেখে ফরিদুল ইসলাম নামে এক কট্টর মুসলমান ইসলামের নবী ও ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেছেন শরিয়ত বয়াতি, এই অভিযোগ এনে মামলা ঠুকে দেন। বলা হয়, ইসলামের অবমাননা হয়েছে। বয়াতির বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে বিক্ষোভও হয়। এর পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইদুর রহমানের বক্তব্য, বয়াতি আল্লাহ, নবী, রাসুল নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন ও আলেম সমাজ বিক্ষোভ করেছেন, বয়াতিকে গ্রেপ্তারের জন্যে আলটিমেটাম দিয়েছেন। মামলাও হয়েছে। সেজন্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযুক্ত হয়েছেন।

এই ঘটনায় লোকজ শিল্পীরা বিক্ষুব্ধ। তারা বলছেন, যুগ যুগ ধরে লোকজ শিল্পীরা গানের ভাব বা কথা ব্যাখ্যা করার পর গান পরিবেশন করেন। একে কেন্দ্র করে এমন গ্রেপ্তারের ঘটনা বাউল ধারার বিরুদ্ধে একটা বড়ো আঘাত। লোকজ গানের বিশিষ্ট শিল্পী কৃষ্ণকলি ইসলাম বলেন, কবিগানের লড়াই এটাতো চিরন্তন শরিয়ত ও মারফতির লড়াই। এই লড়াই বুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে হতো। কিন্তু এবার যা হলো, তাতে প্রমাণ হলো যে, আমাদের দেশে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা বার বার আহত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এই বাউল শিল্পী ইসলামে গানকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, সেটা তুলে ধরেছেন। কারণ সমাজে এক ধরনের অপব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। বয়াতি এই অবব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, এই ঘটনা সংগীত জগতের ওপর আঘাত। এই বয়াতির বক্তব্য, ইসলামে সংগীত নিষিদ্ধ নয়। আমাদের সমাজে কট্টর ইসলামপন্থীরা ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। বয়াতি তারই জবাব দিয়েছেন। তিনি ইসলামকে উদার দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু ইসলামপন্থীরা আজ অসহিষ্ণুতার এতো উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে, তা মানতে নারাজ। সরকার এই গ্রেপ্তারের মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়ালেন। সমাজে এই বার্তা গেল, কেউ গান গাইতে পারবে না, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারবে না। বাউল-বয়াতিরা কি সামনে এগুতে সাহস পাবেন? বাংলা অ্যাকাডেমির লোকসংগীত গবেষক সাইমন জাকারিয়া বলেছেন, গ্রামের মানুষ থানায় গিয়ে একজন শিল্পীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, এটা খুব স্বাভাবিক বিষয় নয়। এর সঙ্গে অন্য বিষয় জড়িত। বাংলাদেশে এমন অসহিষ্ণুতা আগে কখনো দেখা যায়নি। সাইমন জাকারিয়া আরও বলেন, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে, আমাদের শিক্ষা ও প্রশাসনে ওরা প্রাধান্য পাচ্ছে। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক জগতে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। এটা সংগীত জগতে অসুস্থ মানসিকতার লক্ষণ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেত্রকোনায় হেফাজতে ঈমান নামে এক উগ্র ইসলামি সংগঠনের দাবির মুখে লালন অনুসারীদের একটি অনুষ্ঠানে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা সম্মর করিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়, এটা বর্তমান সরকারের আমলেই হয়েছে। এটা লালনের গানের এক বাৎসরিক অনুষ্ঠান ছিল। হেফাজতে ঈমান নেতারা হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, লালনের গান ইসলাম-বিরোধী। এই গানকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। এর আগে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, রাজবাড়ি ও নাটোরে লালনভক্তদের সাধুসঙ্গে হামলা করা হয়েছে। বাউলরা নানা জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছে। বাউলরা অভিযোগ করেছেন, তাদের ওপর হামলা হলে প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। বাউল নেতা পাগলা বাবলু বলেছেন, কষ্টটা হচ্ছে, যেখানে লালন সাঁই বলেছেন, মানুষ ভজলে সোনার মানুষ পাবি, আমাদের ইসলাম-বিরোধী বলা হচ্ছে। আমরা মানুষকে বড়ো করে দেখি এটা আমাদের ঘোরতর অপরাধ। কষ্ট শুধু আমাদের মধ্যে নয়, সমগ্র দেশে লোকশিল্পীদের মধ্যে কালো মেঘের ছায়া পড়েছে। ■

অভ্যর্থনা জানানো যাঁদের কাজ

অভ্যর্থনা জানানো যাঁদের কাজ

রূপশ্রী দত্ত

চলতি কথায় যাঁদের বলা হয় রিসেপশনিস্ট বা অভ্যর্থনাকারিণী, চাকুরিজীবী মেয়েদের মধ্যে বেশ কয়েক বছর তাঁরা স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

বড়ো হোটেলে বা বড়ো কোম্পানির সামনের কাউন্টারে বসে থাকা যে সুবেশা ভদ্রমহিলা, কোনও ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করছেন; পরক্ষণেই পাশের সহকর্মীকে কোনও নির্দেশ দিচ্ছেন, আবার পাঁচ মিনিট অন্তর বেজে ওঠা টেলিফোনের 'কল' 'অ্যাটেন্ড' করছেন, সর্বোপরি মুখে রয়েছে একটি স্মিত হাসির মৃদু প্রলেপ। এরাই হলেন অভ্যর্থনাকারিণী।

কিন্তু এই আপাত প্রসন্নতার আড়ালে তাঁদের দুঃখবেদনাটুকু সযত্নে গোপন করার মধ্যেই বোধহয় তাঁদের ব্যবসায়িক সাফল্য নিহিত থাকে। কখনও কোনও কারণে এই সব মেয়েদের পেশাদারি পর্দা সরে গেলে বোঝা যায়, জায়া কন্যা জননীরূপে আমাদের চারপাশে দেখা বোনেদের সঙ্গে এঁদের কোনও তফাতই নেই। প্রাসঙ্গিকভাবে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানাই। কিছুদিন আগে দিল্লিতে গিয়েছিলাম। সেখানকার হোটেলে এমনই একটি মেয়েকে দেখেছিলাম। সুবেশা, সুন্দরী পারসি মেয়ে। সুন্দর, শোভন তাঁর পোশাক; শান্ত, লাবণ্যময়ী চেহারা। কাউন্টারে বসে থাকত সে। 'বোর্ডার'রা বেরোবার সময়, ঘরের চাবি রেখে যেত, তারই হেফাজতে। ডাইনিং রুম অপেক্ষাকৃত ফাঁকা পেলে, সে চট করে কোণের দিকে একটি চেয়ারে বসে লাঞ্চ ও ডিনার সেরে নিত। আর চোখাচোখি হলে, মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে দিত। তার হাসি দেখে, কেন জানি না মনে হতো, বাঙ্গালি মেয়ে হলে, তাকে 'সুস্মিতা' নামে খুব মানাত।

সেই মেয়েই একদিন কাউন্টারে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সামনে খোলা ছিল, সেদিনের খবরের কাগজ। সহকর্মীরা দূরে যে যার আপন কাজে গভীর ভাবে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর আবহাওয়া। সান্ত্বনা দিতে আসেনি কেউ। সেই অবস্থাতেই মেয়েটি হোটেলে ফিরে আসা প্রত্যেকটি বোর্ডারকে তাদের ঘরের চাবি ফিরিয়ে দিয়েছিল। কর্তব্যের কাছে দুঃখের অবকাশ নেই। বোর্ডারদের একজন সৌজন্যের খাতিরে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এনিথিং রং?' মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিয়েছিল— 'নো। ইটস্ অলরাইট'। বিকেলেই আবার তাকে দেখেছিলাম--- মুখে সেই স্নিগ্ধ হাসির প্রলেপ।

পরে হোটেলের এক বেয়ারার মুখে শুনেছিলাম, সেদিনের খবরের কাগজে ব্যক্তিগত কলমে বেরিয়েছিল, তার কোনও দূরস্থিত আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ।

সেদিনই বুঝেছিলাম, আমাদের এই বোনেদের কাছে কাজ শুধু কাজ নয়। তা হলো সাধনা। নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ভুলে কর্তব্যের আহ্বানে প্রস্তুত হওয়ার সাধনা।

সেদিন তাই মনে হলো, অভ্যর্থনা যাঁদের কাজ, সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে আর একটু সহৃদয় অভ্যর্থনা বোধহয় তাঁরাও দাবি করতে পারবেন।

চিঠিপত্র

তিতুমীরকে স্বাধীনতা যোদ্ধা বানিয়েছে প্রথমে কংগ্রেস

স্বস্তিকা পত্রিকায় অভিমন্যু গুহর অভিযোগ, জেহাদি তিতুমীরকে স্বাধীনতা-যোদ্ধা বানানোর কৃতিত্ব বাম-ইসলামিক ইতিহাসবিদদের। অভিযোগটি পুরোপুরি ঠিক নয়। যতদূর জানা যায়, এই অপকর্মটি সর্বপ্রথম করেছিলেন, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট (১৮৯৫ ও ১৯০২ খ্রি.) স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)। তাঁর সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক বেঙ্গলতে ২৩.৮.১৯০১ তারিখে একটি নিবন্ধে তিনি তিতুমীরকে 'বাঁশের কেল্লার বীর' ('Hero of the Bamboo Stokode') বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা তিতুমীরকে 'কৃষক' বিদ্রোহীতে রূপান্তরিত করেছেন। নরহরি কবিরাজ মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ('from a Marxist Staudpoint') তিতুমীরের আন্দোলনকে 'a peasant rising in a roligious garb' বলে চিহ্নিত করেছেন—('wahabi and Farazi Rebele of Bengal', pp. vii, 51-52)। তিতুমীর অবশ্যই একটা আন্দোলন করেছিলেন, সেই আন্দোলনের মূলে ব্রিটিশ বিরোধিতা কিংবা 'কৃষক-স্বার্থ' জড়িত ছিল না।

তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নিসার আলি। ছেলেবেলায় প্রায়ই রোগে ভুগতেন বলে তাঁকে তেতো ভেষজ ওষুধ খাওয়ানো হতো, তিনিও নির্বিবাদে তা খেয়ে নিতেন। সেজন্য পিতামহী জয়নাব খাতুন আদরের পৌত্রের নাম দিয়েছিলেন, তিতা মিঞা। তা থেকেই 'তিতুমীর' নামের উৎপত্তি। তিতুমীরের জন্ম এক সম্পন্ন কৃষক পরিবারে। পিতার নাম মীর হাসান আলি। নরহরি কবিরাজের কথায়, গ্রামে তাঁদের স্থান ছিল— "...did not in any way belong ot the village aristocracy, ...was above the ordinary villagers"— (ঐ, পৃ. ৩০)। বিবাহসূত্রে তিতুমীর খুশি আমির নামে জনৈক গণ্যমান্য ভূস্বামীর সম্পর্কিত ছিলেন। অবস্থাপন্ন এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত পরিবারের সন্তান হয়েও তিতুমীর কেন নদীয়ার এক হিন্দু জমিদারের লাঠিয়ালের চাকুরি নিয়েছিলেন তা জানা যায় না। শুধু জানা যায়, ওই চাকুরিকালে এক লাঠালাঠির ঘটনায় তাঁকে জেল খাটতে হয়েছিল। তারপর কলকাতায় 'ওয়াহাবি' প্রচারক সৈয়দ আহমদ বেরিলবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বেরিলবী ও তাঁর দলবলের সঙ্গে তিনি 'হজযাত্রা' করেন, (দ্র. ২৫.১১.১৮৩১ তারিখের 'ইন্ডিয়া গেজেট')। 'হজ' করে ফিরে আসার পর বছর তিনেক তিতু যে কী করছিলেন, তা জানা যায় না। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে পয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ় তিতুমীর নারকেলবেড়িয়ার নিকটবর্তী হায়দরপুর গ্রামে আসেন এবং 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া' মতবাদ প্রচার শুরু করেন।

তখনকার দিনে নামে বা বেশভূষার গ্রামীণ মুসলমানরা প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে মোটেই পৃথক ছিলেন না। খাটো ধুতি ও কাঁধে গামছা, এই ছিল গ্রাম্য মুসলমানদের পোশাক। দাড়ি রাখা বা না রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। হিন্দুদের নানা আচার অনুষ্ঠানে তাঁরা যোগ দিতেন। আবদুল বারি, 'A History of the Fredom Movement'–Vol. 1 (Karachi, 1960) পুস্তকে 'The Reform Movement in Bengal' প্রসঙ্গে লিখেছেন— "The lower order of the Muhammedan Community had become so much indistinguishable from the Hindu raiyats that they had not only observed Hindu rites and festivals but adopled the Hindu names, such as, Gopal, Nepal, Gobardhan etc."। তিতুমীর ফতোয়া জারি করলেন : কাছা দিয়ে কাপড় পরা চলবে না, পুরোপুরি আরবি নাম রাখতে হবে। শরিয়ত মোতাবেক গোঁফ ছাঁটতে হবে, দাড়ি রাখতে হবে, মাথার মাঝখানটা কামাতে হবে। বিবাহ বা শ্রাদ্ধ উৎসব করা, পিরের কবর সাজানো বা তার ওপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা, মৃতের বাৎসরিক উৎসব করা— ওই সবই শরিয়ত বিরুদ্ধ কাজ। ওই সব করা চলবে না। তিতুর অনুগামীদের 'মৌলবি' বলা হতো। মৌলবিরা জোরজুলুম করে ওই ফতোয়া চালু করতে গেলে সাবেকি মুসলমানদের তাদের বিরোধ বাধে। জমিদারেরা বলেছেন, পিতৃদত্ত নাম কেউ পালটাতে পারবে না, দাড়ি রাখতে পারবে না ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ওই সময়ে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দাড়ি রাখার রেওয়াজ ছিল না। মৌলবিরাই শুধু দাড়ি রাখতে শুরু করেছিল। পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মৌলবিদের প্রতিজনের দাড়িতে আড়াই টাকা করে কর বসিয়ে ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং হজরত মহম্মদের আদেশ : "বহু দেবদেবী-বাদীদের বিরুদ্ধে কাজ করো, গোঁফ ছোটো করে ছাঁটো এবং দাড়ি রাখো" (মহী মুসলিমের ৫৫০ নং হাদিস)। সুতরাং দাড়ির ওপর ন্যস্ত কর হাদিশ (নবীর নিজস্ব আচার ও বাণী) অনুরক্ত তিতু এবং তাঁর অনুগামীদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। তিতুর সহযোগী সাজন গাজির গানে আছে : "কি দাড়ি জরিমানা আড়াই টাকা হয়। সেইজন্য সরাওয়ালা বড়ো খাপা হয়।।"

মৌলবিরা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে মামলা দায়ের করে। কয়েকজন নিরপেক্ষ সাক্ষীকে আদালতে তলব করা হয়। তাদের সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয়, বাদী-প্রতিবাদী কোনো পক্ষই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। বিচারক বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. আলেকজান্ডার বিবাদ- বিসংবাদ এড়ানোর সহজ পথ হিসেবে উভয় পক্ষকে শান্তি বজায় রাখার জন্য পঞ্চাশ টাকার একটা বন্ড দিতে বলেন। বিচার মনঃপূত না হওয়ায় মৌলবিরা গ্রামের এক মোক্তারকে সঙ্গে নিয়ে আপিল করতে কলকাতা যায়। কিন্তু ওই সময় দুর্গাপূজার জন্য আদালত বন্ধ থাকার দরুন আপিল দাখিল করা হয়ে ওঠেনি। পূজাবকাশের পর আদালত খোলার পরে মৌলবিরা আর আপিল দাখিল করেনি। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ 'নবরূপে তিতুমীর' পুস্তকে তা না করার সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

'হজ' করে ফিরে আসার পরে তিতু সরফরাজপুর ক্ষতিগ্রস্ত একটি কোঠাবাড়ির ছাদ ফেলে দিয়ে নতুন করে উলুখড়ের ছাদ লাগিয়ে স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেটি তাঁর 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া' মতবাদ বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র

হয়েছিল। কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর মৌলবিরা আর সেখানে যায়নি। নারকেলবেড়িয়ায় তিতুর অনুগামী এক অবস্থাপন্ন কৃষকের পঞ্চাশ বিঘার মতো নিষ্কর জমি ছিল। তিতুর ভাগিনেয় গোলাম মাসুমের তত্ত্বাবধানে অজস্র বাঁশ দিয়ে সেই জমিতে একটি বুরুজ বানানো হয়। ২৩ অক্টোবর রাতে সেখানে একটি বিরাট ভোজসভা হয়। প্রথম ঘটনা ঘটলো ৬ নভেম্বর। প্রায় পাঁচশো জেহাদি নিয়ে গোপাম মাসুম পুঁড়ার বাজার লুটতরাজ করে, একটি গোরু মন্দিরের সামনে কেটে সেটির রক্ত মন্দিরের গায়ে ও বিগ্রহে ছিটিয়ে দেয়। তারপর গোরুটিকে চারভাগ করে কেটে বাজারের চার কোণে টাঙিয়ে দেয়। পরের দিন ৭ নভেম্বর ইছামতী নদীর অপর পারে লাউঘাটি বাজারে হানা দিয়ে তারা একই কাণ্ড করে। নরহরি কবিরাজ লিখেছেন— "...they commenced operations by the repetition of the same outrage to the religious feelings of the Hindus which they had committed at Poorwa viz. the slaughter of a cow in that part of the village ecxlusivoly occupied by Hindu residents..."-(p. 38)। ওইসব অগ্রণী ছিল তিতুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফকির কুরবান শাহ। ১৬.১১.১৮৩১ তারিখের ইন্ডিয়া গেজেট ব্রাহ্মণদের মুখে গোরুর মাংস গুঁজে দিয়ে ইসলামায়নের বর্ণনা আছে। সাজন গাজির গান আছে :

বামনের মেয়ে এনে নেকা দেয় কতো জনে
সাঁকা ডাঙ্গি হাতে দিল চুড়ি।
বামন গোনেরে ধেরে কলমা পরায় জোরে
গাও গোস্ত তারা খাইয়া কাপড় পরে ওন্দারা দিয়া
কাছা খুলে সবে গেল বাড়ি।।

তবে শুধু ব্রাহ্মণদেরই নয়, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট জে. আর. কলভিনের ১০.৪.১৮৩২ তারিখের রিপোর্টে আছে, নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে।

তিতুমীরের সাঙ্গপাঙ্গরা নারকেলবেড়িয়ার চারপাশে কয়েক মাইল ব্যাপী এলাকায় ('for miles roud Narkelbaria') এমন তাণ্ডব চালাচ্ছিল যে, সন্ত্রস্ত হিন্দুরা এবং সাবেকী মুসলমান— যারা তিতুর মতবাদে সায় দিতে পারছিল না— গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছিল। সাফল্য-গর্বী তিতু ঘোষণা করলেন, দেশে এখন মহম্মদের দ্বীনের রাজত্ব, এবং তিনি এই দার-উল-ইসলামের ইমাম। সুতরাং তাঁকেই খাজনা দিতে হবে— "This country is now given to our Deen Mulammad, you must therepre immodiable send grain for the army. If you send grain you shall be distinguished in the presence and for three years your revenue will be remitted. If you do not send it, then on receiving the answer to this parwana we shell come and fight against you." Signed : Nosar Ali's son, Titu Mir. (India Gazette, 13 December, 1831)।

তিতুমীরের প্রথম জীবনীকার বিহারীলাল সরকার তিতুমীরকে 'ধর্ম্মোন্মাদ' বলে আখ্যাত করেছেন। ধর্মাদর্শ ও কর্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে ওই অভিধাই তিতুমীরের যথার্থ প্রাপ্য।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
পর্ণশ্রী, কলকাতা।

১৯৪৬-এর পদধ্বনি

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রতিবেদন পাঠ করে আশঙ্কা প্রকাশ করছি। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' তথা ভয়াবহ দাঙ্গা সংগঠিত করে হাজার হাজার হিন্দু নর-নারীকে হত্যা, খুন, ধর্ষণ, হিন্দুদের দোকান, বাড়ি লুটপাট করে প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায়। পঞ্জাবেও ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত করে মুসলিম লিগ। লক্ষ লক্ষ পঞ্জাবি, হিন্দু, শিখ খুন, নারী ধর্ষণ অবলীলায় সংঘটিত করে। একই ভাবে ১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর কোজাগরি পূর্ণিমার রাতে নোয়াখালির বিস্তীর্ণ এলাকায় একযোগে জেহাদি মুসলমানরা হিন্দুদের হত্যা, খুন অবলীলায় চালিয়ে ও হাজার হাজার মহিলাকে ধর্ষণ করে, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে। দীর্ঘদিন এই হত্যালীলা চলে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লিগের দাবি মেনে ২৩ শতাংশ মুসলমানদের জন্য ২৯ শতাংশ ভূমি দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পূর্বপাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান।

সেই দিনগুলির কথা আজও ভুলতে পারিনি। আমার জন্ম উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলার প্রত্যন্ত দুয়াল্লি গ্রামে। স্বাধীনতা লাভের ৭৩ বছর পরও আবার সেই কলঙ্কময় দিনগুলি প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দ ফিরিয়ে আনতে চাইছেন না তো? তৃণমূল কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা মুসলমান দরদি হয়ে মাঠে নেমেছে। তাই কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল-সহ সকল বিরোধীরা 'নাগরিকত্ব সংশোধন আইন-২০১৯ (সিএএ-র) বিরোধ করছে। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে সিপিআইয়ের নেতারা কলকাতায় মিছিল করে 'পাকিস্তান দিতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে বলে' দাবি করেছে। সেই সময় কংগ্রেস দল যদি জিন্নাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনিত করত তাহলে ভারত ভাগ হতো না। গান্ধীজীর মানসপুত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী করতে গিয়েই এই ভারত ভাগ।

কংগ্রেস আবার সেই ভুল কাজটি করতে চলেছে। এ আই ইউ টি এফ নেতা বদরুদ্দিন আজমলের হাত ধরা ছাড়া কংগ্রেসের কোনো উপায় নেই। অসমে 'ভারতীয় জনতা' দলকে হারাতে সংখ্যালঘু ভোটের যাতে বিভাজন না হয় সেই লক্ষ্য নিয়েছে ১৩৫ বছরের পুরনো দলকে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে দলের ভূমিকা ছিল, সেই দলকে (কংগ্রেস) ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের দলে পরিণত হয়েছে। শেষ রক্ষা হবে তো?

—**গুরুপদ চন্দ,**
দীঘা, ঘোষপাড়া, নদীয়া।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

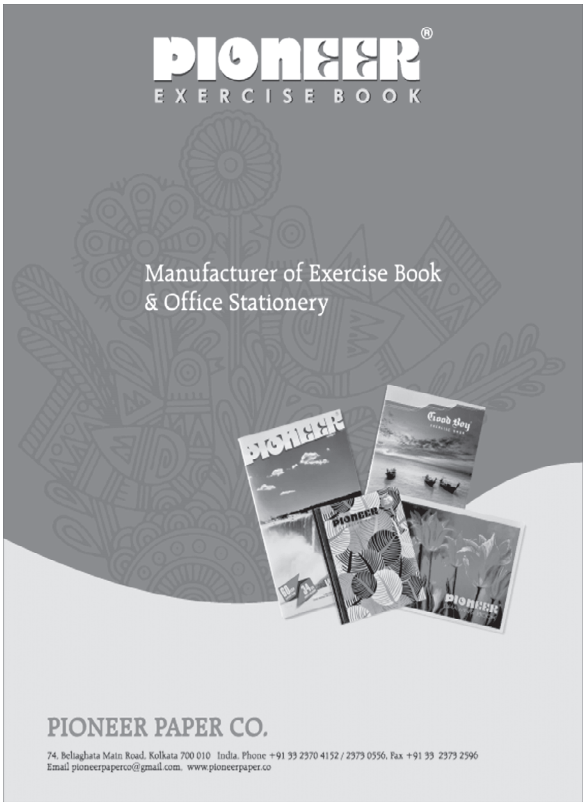

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

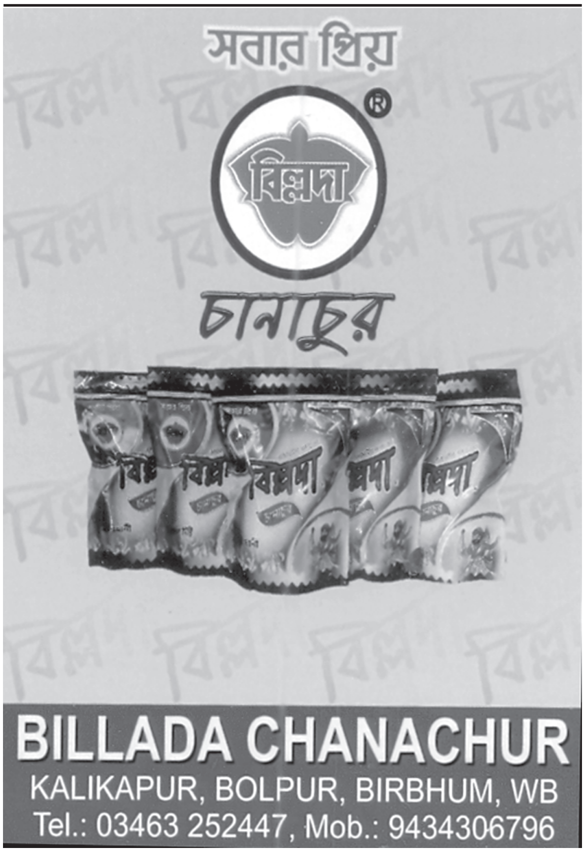

With Best Compliments
From :

সকলের জন্য রহিল
বাংলা শুভ নববর্ষের
প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সৌজন্যে ঃ-
Ram Chandra Agarwal
Advocate

With Best Compliments
From :

LEADSTONE INTERNATIONAL LLP.

19, R. N. Mukherjee Road,
1st Floor, Kolkata 700 001
Ph. +91 33 2248 1789/ 1790
Email : leadstone.intl@gmail.com

With Best Compliments
From :

S E Builders and Realtors Ltd.

'Vishwakarma', 86C, Topsia Road (South)
Kolkata, Pin - 700 046

With the Best Compliments

From :

VAIBHAV HEAVY VEHICLES LTD.

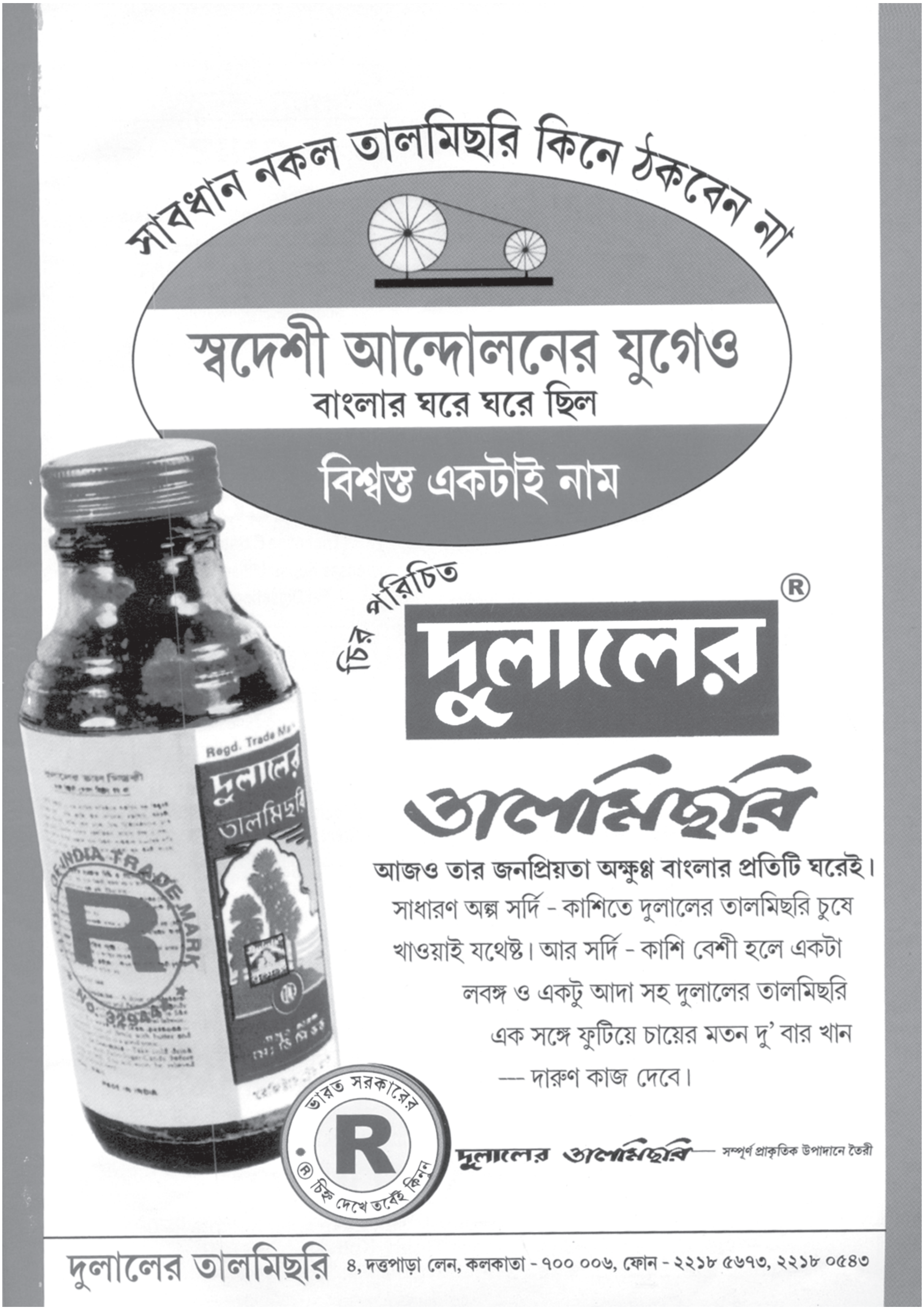

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
ভারত সরকারের
R
চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

With Best Wishes :-

Radha Electricals Private Limited

Factory :

Jalan Industrial Complex

Gate No. 3, Mouza - Beniara, P.S.- Domjur

Dist. - Howrah - 711 411

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in

Fax : 91-33-22202260

GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas

Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)

Sresth Products Private Ltd.

Regd. Off.-
49, Strand Road, Kolkata-700 007

Admn. Off. -
67/50, Strand Road, Kolkata-700 007

With Best Compliments From :-

Rajesh Kankaria

With Best Compliments From :

EPC Electrical Private Limited.

71A, Tollygunge Road, Kolkata - 700 033
Phone :- 24241240/ 7108, Telefax No. 2424-7108
E-mail : epc@epcfans.com
Website : www.epcfan.com

Manufacturer of

Heavy Duty Exhaust Fans, Air Circulator, Mancooler, Axial Flow Fan, Motor

WE HAVE DEALERS ALL OVER INDIA

SHREE VENKATESH PAPER MART

"KARWA HOUSE"

64, NALINI SETH ROAD, KOLKATA-700 007

Email : svp@cal2.vsnl.net.in / svpoo7@dataone.in

Distributors :

PAPER & PAPER BOARD

Phone : 2274-5398, 2274-0889, 2274-2447, Mobile : 9830026151, Fax : 2274-2164

CAPITAL TRANSPORT CORPN. OF INDIA

H.O.

25, Gangadhar Babu Lane, Kolkata - 700 012 Phone : 2215-4312, 2236-0713

Branches:

Aligarh l Mumbai * Delhi l Durgapur * Hyderabad l Chennai * Vezianagaram

For Enquiry 96741 78500 / 98363 63300

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street,
Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352
Ph. 2229-0492
e-mail : wadhwana@vsnl.com

nmc
JAS-ANZ

NANDA MILLAR COMPANY

Engineers s Consultants
Manufacturers s Exporters

1/2, Chanditala Branch Road,
(Near Behala Chandi Mandir)
Kolkata - 700 053, India
Phone : 24030411
Mobile : 98300 78763, Fax : 91-33-24030411
E-mail : nmc@nandagroup.com
Web Site : www.nandagroup.com

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

DURO™

STYLES CHANGE.

DUROBILITY REMAINS.

1960's

1990's

2020's

Be it the changing styles of furniture or the modernization of techniques, Duroply has seen it all. Founded in 1957, it has been a part of a timeless journey of furniture-making, giving solid support to the design demands of each decade.

Being crafted with expertise and maintaining its quality benchmarks, it has always stood the test of time, living up to the **promise of Durobility.**

The Forest Friendly Company

Duroply Industries Limited

(Formerly: Sarda Plywood Industries Ltd.)

113 Park Street, North Block 4th Floor, Kolkata-700016 | P: (033) 22652274 | Toll Free: 1800-345-3876 (DURO) | E-Mail: corp@duroply.com

Website: www.duroply.in | Find Us On: duroplyindia

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE™
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

(৫১)

SURYA
Energising Lifestyles

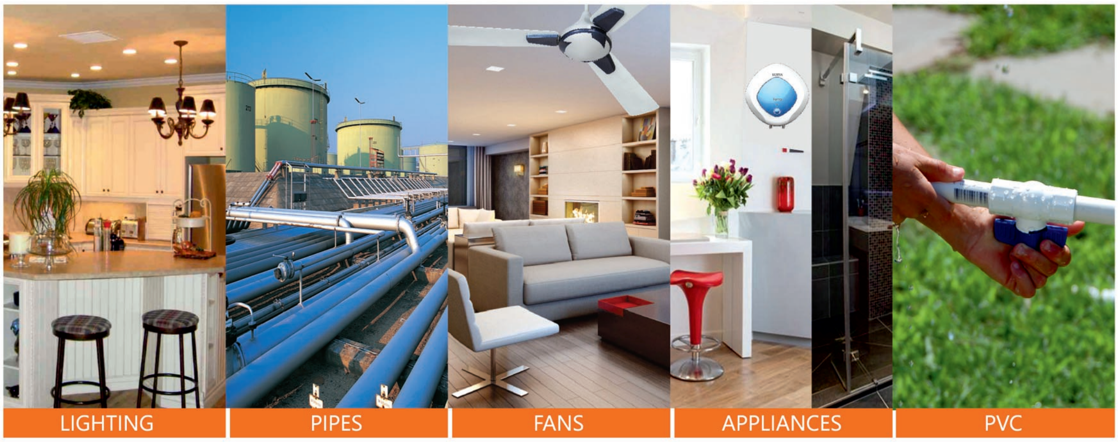

Surya products are not only available in India but are also exported to more than 50 countries across the globe.The company promises to enlighten the lives of all on the path of growth & development.

SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in I Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No. : 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni